KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : নাসির চৌধুরী
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৮/৭ ৪৮/৮ ৪৮/৯ ৪৮/১০ ৪৮/১১	Year of Publication : Nov 1987 Dec 1987 Jan 1988 Feb 1988 March 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রঊফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

ডিসেম্বর ১৯৮৭

আন্তর্জাতিক পরিসরে আসন্ন একবিংশ শতকে অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রতিশ্রুতির সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কোথায়? এমন-কি তৃতীয় বিশ্বেও তার স্থান নিম্নগামী। বৈদেশিক বাণিজ্যে পশ্চাদ্‌গতি; সরকারি শিল্পক্ষেত্রে লোকসানের অঙ্ক ক্রমবর্ধমান; অধিকাংশ বিনিয়োগ কেবল বিলাস-পণ্য উৎপাদনে। এই নাগপাশ থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উদ্ধারের পথ কী? অর্থনীতির অধ্যাপনায় নিযুক্ত প্রবালকুমার দাসের তথ্যাশ্রয়ী মতান্ধতামুক্ত বিশ্লেষণ □ সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের প্রখর-ক্ষমতাশালী গল্পকার হাসান আজিজুল হকের গল্পের জায়গা, জমি ও মানুষের পরিচয় কী? উত্তর সন্ধানে অধ্যাপক সুবীর রায়-চৌধুরীর বিশ্লেষক প্রবন্ধ। □ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতের সকল ক্ষেত্রে চলেছে ঘোর অনাচার। সম্প্রতি তার একটি উৎকট প্রকাশ টিউটোরিয়াল হোম। শিক্ষাকে ব্যাবসার পণ্য করে তোলার ব্যাপক আয়োজন নিয়ে সমীক্ষা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ। □ আমাদের জীবনে ধর্মবিশ্বাসের ভালোমন্দ নিয়ে উদ্দীপক আলোচনা □

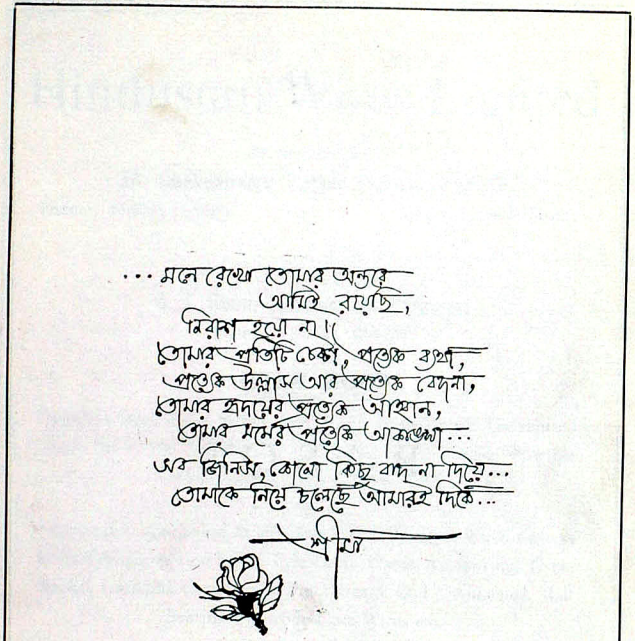

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৮
ডিসেম্বর ১৯৮৭
অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

ভারতের আর্থিক নীতির সাম্প্রতিক প্রকৃতি প্রবালকুমার দাস ৬৬১
হাসান আজিজুল হকের গল্পের জায়গা জমি মানুষ সুবীর রায়চৌধুরী ৬৮৭
শিক্ষা যখন ব্যাবসার পণ্য অভিজিৎ করগুপ্ত ৭০৫
বাংলাদেশ : ভিন্ন পর্যায়, ভিন্ন তথ্য শুভেন্দু দাশগুপ্ত ৭১৭

'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' বিরাম মুখোপাধ্যায় ৬৬৮
স্বাপ্নিকের মৃত্যু খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৬৭০
অপর্ণা আর মল্লিকা কামাল হোসেন ৬৭১
বৃদ্ধ যুবাকে ডেকে স্বপন রায় ৬৭২

তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৬৭৩
অনিবার্য আবুল হাসানাত ৬৯৫

গ্রন্থসমালোচনা ৭২৮
সত্যজিৎ চৌধুরী, তাপস বসু, রণেন্দ্রনাথ দেব

অন্য পথে ৭৩৬
ধর্ম ও আধুনিক সমাজ সনাতন মিত্র

চিত্রকলা ৭৩৯
অন্বেষণের শিল্পকর্ম হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সিনেমা ৭৪২
দেবশিশু অভিজিৎ করগুপ্ত

স্মরণে ৭৪৬
হেমাঙ্গ বিশ্বাস কমলেশ সেন

মতামত ৭৪৮
অশোক মৈত্র, সুপ্রতীক বাগচী

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

চলার পথে নতুন সাথী

VIP III MOPED

- কিক স্টার্ট
- থ্রি-স্পীড গীয়ার
- তেলের সাশ্রয় : 1 লিটারে 89 কি·মি·
- শক্তিশালী ইঞ্জিন
- ফুট ব্রেক
- বিশ্ববিখ্যাত ইতালীর AGRATI-GARELLI S.p.a.-এর সহযোগিতায় তৈরী

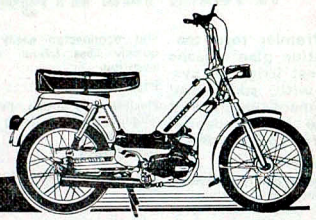

AVANTI GARELLI

AVANTI GARELLI

Sold & Serviced by
Expo Machinery Limited
Santiniketan Bldg. 6th. Floor, 8, Camac Street
Calcutta-700017 Ph: 44-1006/43-1326

A product of
Kelvinator of India Limited

Authorised Dealer

M/s. Karni Trading Corpn.,
N.N. Road,
Cooch Behar-736 101. PH. 205

M/s. Sukanta Pvt. Ltd.,
Hill Cart Road,
Siliguri, Dist: Darjeeling.
PH. 21144

একসূত্রে

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার
বাইশটি রসোত্তীর্ণ ছোটোগল্পের সংকলন

দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
চতুরঙ্গ কার্যালয়

ভারতের আর্থিক নীতির সাম্প্রতিক প্রকৃতি

প্রবালকুমার দাস

১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধী বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সরকারি আর্থিক নীতিতে একটি বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অনেকের মধ্যে জেগেছিল। চীন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির আর্থিক নীতির খোলনলচে পালটে ফেলা, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দক্ষিণপন্থী আর্থিক নীতির অনুসরণ, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে উদারনীতির নতুন হাওয়া—এ সবকিছু থেকে মনে হয়েছিল, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার বিপুল গণসমর্থনের সুযোগ নিয়ে দৃঢ়তাসহকারে আর্থিক সংস্কারগুলি কার্যকর করবেন। কিন্তু খাপছাড়াভাবে কিছু নীতি কার্যকর করা—যেমন MRTP-র সীমা বাড়ানো, শিল্পগুলিকে কিছুটা অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা অথবা প্রত্যক্ষ করের হার কমানো ছাড়া ব্যাপক সংস্কারের পথে সরকার পা বাড়ান নি। যে রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে চীন, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, অথবা জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আর্থিক উন্নয়নে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, ভারতের মতো দেশে তার অনুপস্থিতি এবং জনপ্রিয় নীতি গ্রহণের রাজনৈতিক চাপ সম্ভবত রাজীব সরকারের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে অনুসৃত আর্থিক নীতিটির সাফল্য এবং ব্যর্থতা সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমরা অগ্রগতি এবং সাফল্য পরিমাপের জন্য দুটি প্রান্ত-বছর বেছে নিচ্ছি। এই দুটি হল ১৯৫০ ও ১৯৮০ সাল। এই সময়ের মধ্যে আমাদের অর্থনীতি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে তার যেমন বিচার করব, সেই সঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান তুলনামূলকভাবে কতটা বদলেছে তাও আলোচনা করব।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে ২·৮ গুণ (বাৎসরিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হারটি হল ৩·৫ শতাংশ)। কয়লার উৎপাদন বেড়েছে ৩ গুণ, সিমেন্টের ৬ গুণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০ গুণ এবং সারের উৎপাদন বেড়েছে ১০০ গুণ। শুধু তাই নয়, শিল্প-উৎপাদনে বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। নানা নতুন ধরনের শিল্প, যেমন মেশিন টুলস, ইলেকট্রনিকস, পাওয়ার জেনারেটর ইত্যাদি দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রাক্-স্বাধীনতা কালের সঙ্গে যদি তুলনা করি, তাহলে অবশ্যই স্বাধীনতা-উত্তর যুগের

আর্থিক অগ্রগতি আমাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হবে। মনে হবে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। কিন্তু আমাদের সাফল্যকে যদি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করি তাহলে দেখব, সারা বিশ্ব এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে দৌড়ে আমরা হেরে গিয়েছি। অবশ্য এই ধরনের তুলনার পরিসংখ্যানগত সমস্যা রয়েছে, কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের তুলনা থেকেই ভারতীয় অর্থনীতির আর-এক ধরনের মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

১৯৫০ সালে সারা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২ শতাংশ উৎপাদন করত ভারত, ১৯৮০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১·৪ শতাংশে। ওই একই সময়ের মধ্যে ভারতের অংশ তৃতীয় বিশ্বের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ থেকে কমে ৫·৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, তৃতীয় বিশ্বের ২০ শতাংশ মানুষ বাস করে ভারতবর্ষে।

এবারে শিল্পোৎপাদনের দিকে তাকানো যাক। ১৯৫০ সালে সারা বিশ্বের মোট শিল্প-উৎপাদনে ভারতের অংশ ছিল ১·২ শতাংশ। আর ১৯৮০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ০·৭ শতাংশে। অবশ্য এই হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। এদের ধরলে শিল্প-উৎপাদনে ভারতের অংশটি কমে দাঁড়াবে ০·৫ শতাংশে। তৃতীয় বিশ্বের শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ১৯৫০ থেকে ১৯৮০র মধ্যে ভারতের অংশটি ১২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪·৬ শতাংশে, এবং চীনকে ধরলে তা দাঁড়াবে ৩ শতাংশে। ১৯৫০ সালে শিল্প-উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান ছিল ১০ম, এখন তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৭তম। এই সঙ্গে যদি ভারতের বিপুল জনসংখ্যার কথা ধরি, তাহলে মাথা-পিছু শিল্প-উৎপাদনে ভারতের উপরে রয়েছে ৩৫টি উন্নত দেশ, এবং ৬৫টি উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই পশ্চাদ্‌গতির ছবি। ১৯৫০ সালে সারা বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল ২ শতাংশ, ১৯৮০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ০·৫ শতাংশে। তৃতীয় বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের এই সামগ্রিক পশ্চাদ্‌গতির প্রেক্ষাপটে আর্থিক নীতির কলাকৌশল তথা পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব।

ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরুর আগে থেকেই সারা বিশ্বে উৎপাদন এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জোয়ার শুরু হয়। আমরা এই আন্তর্জাতিক পটভূমিকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই নি। মহলানবিশ-প্রদত্ত ছকটিতে দ্বিতীয়-পরিকল্পনাকালে আমদানি বিকল্পের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটলেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হত। ওই সময়ে যেহেতু রপ্তানি আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ ছিল, রপ্তানি বৃদ্ধির উচ্চ হারও দ্রব্যের চাহিদার ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তনই সূচিত করত। কিন্তু রপ্তানিজাত আয় ভবিষ্যতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটকে কমিয়ে উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে অনেকটা মসৃণ করতে পারত। মহলানবিশের ছকে ধরে নেওয়া হয়েছিল, মৌল শিল্পগুলি স্থাপিত হলে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পোন্নয়ন দ্রুতলয়ে ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল ৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে শিল্পে দীর্ঘকালীন অগ্রগতির হার কমে গিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যে গতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে ভাবা হয়েছিল, তাও ঘটে নি।

নতুন আর্থিক নীতিটিকে আমরা পুরনো নীতি এবং তার রূপায়নের ব্যর্থতার ফল হিসাবেই দেখতে পারি। প্রাক্তন প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান ও বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্কারের উৎসাহী প্রবক্তা এল. কে. ঝা ১৯৮৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত ড. জাকির হুসেন স্মারক বক্তৃতাতে নতুন নীতির তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন।

এইগুলি হল : নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে উৎপাদনমুখী করে তোলা, প্রত্যক্ষ করের হার কমানো, এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো। আমরা বর্তমান নিবন্ধে এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে উন্নয়ন-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করব।

প্রথমেই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মূলধন এবং অন্যান্য উপাদানের পরিকল্পিত বিনিয়োগের জন্য যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পরিকল্পনাকালে গড়ে উঠেছে তা একটি মাথাভারি জটিল প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেই হোক অথবা বেসরকারি ক্ষেত্রেই হোক, যে-কোনো শিল্প স্থাপনের প্রস্তাবের অনুমতি পেতেই কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। এই ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পে প্রতিযোগিতার পথকে রুদ্ধ করেছে। ভারতীয় বণিকসভাগুলিতে প্রায় দেখা যায়, শিল্পপতিরা নিয়ন্ত্রণের জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অভিযোগ করছেন। কিন্তু ঘটনা হল, প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরা এই নিয়ন্ত্রণের আড়ালেই একটি সংরক্ষিত বাজারের সুযোগ পাচ্ছেন; কারণ, নতুন বিনিয়োগকারীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ভেদ করে শিল্পে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিযোগী না থাকা, সেই সঙ্গে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের বাজারে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরা এক ধরনের একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করেন। অথচ পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষবৃদ্ধি এবং ব্যয়হ্রাসের জন্য প্রতিযোগিতা হল একটি হাতিয়ার। প্রতিযোগিতা থাকলেই বিনিয়োগকারীরা ক্রেতাদের অল্প দামে উঁচু মানের পণ্য দেবার চেষ্টা করবেন। প্রতিযোগিতার অভাবেই ক্রেতারা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিম্ন মানের দ্রব্য বেশি দামে কিনতে বাধ্য হন। ভারতের মোটরগাড়ি-শিল্প এমনই একটি উদাহরণ। উৎপাদকদের দিক থেকেও এর ফলে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং ব্যয়হ্রাসের কোনো তাগিদ নেই। ভারতীয় শিল্পে মূলধন-উৎপন্ন অনুপাতটি বেশি হওয়ার এটিও হল একটি কারণ।

এই বিস্তৃত জটিল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যাঁরা মুনাফা কামাতে পারেন স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কাছে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এক ধরনের কায়েমি স্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হল, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হন? এর উত্তর হল, প্রতিষ্ঠিত বড়ো শিল্পপতিরা। কারণ, তাঁরাই শিল্পনিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল কেটে সহজে বেরিয়ে আসতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই নিয়ন্ত্রণের অলিগলি ভালো করে বোঝেন, সরকারি পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটি নানাভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সরকারি প্রশাসনের দিক থেকেও বহুসংখ্যক বিনিয়োগকারীর আবেদন বিচার-বিশ্লেষণ করার চেয়ে অনেক সহজ হল প্রতিষ্ঠিত বড়ো অল্প কিছু শিল্পপতিদের সঙ্গে লেনদেন করা। মিরডাল তাঁর "এশিয়ান ড্রামা"তে এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্পষ্টই মন্তব্য করছেন, It is apparent that big business concerns have good reasons to support the prevailing system of conflicting and discretionary operational controls. The solid basis for that vested interest is the oligopoly power and the extremely high profits the system affords them. (Asian Drama, p. 93)। অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা হল উচ্চ মুনাফা এবং একচেটিয়া ক্ষমতার জন্যই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা আমলাতন্ত্রের হাতে এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সমর্থন করে।

আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল যেন পদে-পদে বাধার সৃষ্টি করা এবং বিনিয়োগকারীকে নিরুৎসাহিত করা। কোনো উদ্যোগী শিল্পপতি যদি উন্নত প্রযুক্তি বা অতিরিক্ত চেষ্টার দ্বারা উৎপাদন অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত উৎপাদনের থেকে বেশি করে ফেলেন, তা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন না এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এল. কে. ঝা তাঁর ড. জাকির হুসেন স্মারক বক্তৃতাতে বলছেন, Any efficient

control apparatus has to rely primarily on the accelerator and the steering wheel and only minimally on brakes. অর্থাৎ একটি দক্ষ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার লক্ষ্য হবে যতদূর সম্ভব কম ব্রেক ব্যবহার করে অ্যাকসিলারেটর আর স্টীয়ারিং হুইলের উপর নির্ভর করে উৎপাদনে কাম্য দিকে গতি সঞ্চার করা। প্রতিযোগিতা, উৎসাহ ও শাস্তিদানের সঠিক নীতি গ্রহণ করেই দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা যেতে পারে।

একইভাবে বৃহৎ মূলধনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রসার ঘটেছে MRTP আইনে (মনোপলিজ অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট্)। এই আইনে ছাড়ের মাত্রাটি কমিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে করে আমলাতন্ত্র যত বেশি-সংখ্যক কোমপানির উপর ছড়ি ঘোরাতে পারেন দত্ত কমিটির (১৯৬৯) মূল সুপারিশে ছিল ভারী বিনিয়োগের শিল্প ও ছোটোশিল্পের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়ন্ত্রণ করা হোক। এই সুপারিশ সত্বেও সরকার এবং আমলাবাহিনী নিজেদের ক্ষমতাহ্রাসের সম্ভাবনায় একেবারেই চুপ করে থেকেছেন। সর্বোপরি, এম. আর. টি. পি কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হল। এম. আর. টি. পি. কমিশনের কাজ হল পরামর্শদানকারী সংস্থার। স্বভাবতই আমলারা তাঁদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এম. আর. টি. পি. আইনে ছাড়ের সীমা ১০০ কোটি করাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখন অনেক বেশি সংস্থাগুলি উদ্যম নিতে পারবে।

আমদানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণটিও অপরিকল্পিতভাবে হয়েছে। পরিকল্পনার শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রার সদ্ব্যবহারের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়। অথচ দেশে আয়-বণ্টনে বৈষম্য কমে নি এবং এর ফলে সমাজের এক-শ্রেণীর বিত্তবানদের বিলাসপণ্যের জন্য চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভব হয় নি। সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা খুব একটা বাড়ে নি, অথচ টিভি, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটরের চাহিদা বেড়েছে। স্বভাবতই বেশি লাভের আশায় এই ধরনের পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারি মূলধন বেশি ভিড় করছে। এর ফলে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আমদানির ক্ষেত্রে উদারনীতি অনুসরণ করা বর্তমান সরকারের একটি ঘোষিত লক্ষ্য।

এইবারে আমরা নীতিগত বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তা হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা। আশা করা হয়েছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হবে। কিন্তু পেট্রলজাত দ্রব্য উৎপাদনের সংস্থাগুলি ছেড়ে দিলে (এর জন্য OPEC-র তেলের দাম বাড়ানোর চেষ্টাটাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়) বাকি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে এই আশা এখনও সুদূরপরাহত। সরকারের ২০০টির মতো সংস্থার মধ্যে দাণ্ডেকর দেখিয়েছেন, ১৯০টিরও বেশি ক্ষতি স্বীকার করছে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যে লোকসান গুনছে তা নয়, রাজ্যসরকারগুলিও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সরকারি সেচ প্রকল্পে, রাজ্য সড়ক পরিবহণে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে—সর্বত্রই লোকসানের পাহাড় গড়ে উঠেছে। ক্ষতির বোঝার ভারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি দেশের শিল্পের বিকাশে আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সমর্থকদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বশাসনের অভাব, অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ—এ সবকিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যর্থতা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের তুলনা করে প্রণব বর্ধন তাঁর The Political Economy of Development নামক বইতে লিখছেন যে, যেসব শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মালিকানা রয়েছে, সেখানে মূলধন-উৎপন্ন অনুপাতটি সরকারি ক্ষেত্রতেই বেশি। শুধু তাই নয়, উৎপাদনক্ষমতার ব্যবহারের দিক থেকেও নৈরাশ্যজনক ফল দেখাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি। যেসব শিল্পে দুরকম মালিকানাই

আছে, বেসরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতার ব্যবহারের অনুপাত অনেক সময় শতকরা পনেরো থেকে কুড়ি ভাগ কম। ১৯৮২-৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ১৬৬ শিল্পসংস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭৪টিতে উৎপাদনক্ষমতার ব্যবহার ৭৫ শতাংশের নীচে এবং ৩২টি সংস্থায় এই ব্যবহার ৫০ শতাংশেরও কম। রাজ্য সরকারের অধীন প্রকল্পগুলির হাল আরো খারাপ। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগে যে রাজনৈতিক প্রসাদ বিতরণ করা হয় তার উদাহরণ প্রণব বর্ধন উল্লিখিত পুস্তকে দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে মধ্যপ্রদেশে বিধাননভায় সরকার পক্ষের বিধায়ক ছিলেন ২৩২ জন। এঁদের ৪২ জনকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে, আর ৭৪ জনকে বিভিন্ন সরকারি আর আধা-সরকারি দপ্তরের কর্তা করা হয়েছে, এবং ১০০ জনকে মনোনীত করা হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে। বর্ধন মন্তব্য করছেন, এইজাতীয় মনোনয়ন নির্ভর করে বিধায়কের দলভুক্ত হবার প্রবণতার উপর, তাঁর কর্মক্ষমতার উপর নয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের এই সার্বিক ব্যর্থতার পটভূমিতেই দাবি উঠেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরিচালনাগত সংস্কারের এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে আরো বেশি সম্প্রসারিত করার। সরকারি এবং বেসরকারি শিল্পগুলি যাতে করে আরো বেশি অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দক্ষ হয় এবং রাষ্ট্রনির্দেশিত অগ্রাধিকারযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে বেশি করে বিনিয়োগ করে, সেইদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। শাস্তিদান ও পুরস্কারের মাধ্যমে শিল্পগুলিতে অপচয় কমাতে এবং উৎপাদনবৃদ্ধিতে রাষ্ট্র সাহায্য করতে পারে।

নতুন আর্থিক নীতির আর-একটি বিতর্কিত বিষয় হল প্রযুক্তির প্রশ্নটিকে ঘিরে। নতুন নীতিতে উদারভাবে প্রযুক্তি আমদানি করতে চাওয়া হয়েছে। একথা ঠিক, আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্বকে অবহেলা করা যায় না। ড. কে. এন. রাজ তাঁর ভি. টি. কৃষ্ণমাচারি স্মারক বক্তৃতাতে সতর্ক করে বলেছেন, বাইরের দুনিয়াতে প্রযুক্তিগত যেসব পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমাদের বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা শিল্পকাঠামোর অনেকটাই সেকেলে হয়ে পড়বে। ইনজিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি বাজার আমরা হারাব তাইওয়ান আর দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। চীন নিজের দেশে সেমিকনডাকটর শিল্প গঠনের তাগিদে আই. বি. এম.-এর মতো বহুজাতিক সংস্থাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে। যাঁরা বাস্তব দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের আদর্শগত গোঁড়ামির চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কে. এন. রাজ বলেছেন, Those who do not realise the implication of all this for India are living in a dream world of their own, even if they be more socially radical versions of Rip Van Winkle.

অবশ্য প্রযুক্তি গ্রহণের অর্থ এই নয় যে তা নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে। নির্বিচার প্রযুক্তি আমদানি বহুদিনের চেষ্টায় গড়ে ওঠা মূলধনী পণ্য-শিল্পকে বিপন্ন করবে। জাতিসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আজ এমনই একটি পর্যায়ে এসেছে যে দুনিয়ার সব দেশই উন্নত প্রযুক্তি অন্য দেশ থেকে গ্রহণের চেষ্টা করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়টিকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? সঠিক পথটি হল নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আমদানিকৃত প্রযুক্তি নিজের দেশের উপযোগী করা। প্রযুক্তি আমদানির ফলে দেশজ প্রযুক্তির বিকাশ যেন না রুদ্ধ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে দেশজ প্রযুক্তি রয়েছে তা বাইরে থেকে আমদানি করা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। যা-কিছু বিদেশী তাই ভালো—এই মানসিকতা ত্যাগ

করার দরকার রয়েছে। জাপান তার আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করেছে, সেই সঙ্গে তাকে গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে আরো বিকশিত করেছে। ফলে জাপান আজ প্রযুক্তির অন্যতম রপ্তানিকারক দেশ।

উদার আমদানি নীতিটিও বহুবিতর্কিত। বলা হয়েছে, উদার আমদানি নীতির ফলে একদিকে যেমন উন্নত প্রযুক্তি আমদানির মধ্য দিয়ে দেশে প্রযুক্তির উন্নত মান অর্জন করা সম্ভব হবে, সেই সঙ্গে বাইরের প্রতিযোগিতার ঝাপটা লাগলে দেশীয় শিল্পগুলি নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে এবং ব্যয় হ্রাস করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যা ভাবা হয় বাস্তবে তা ঘটে না। নতুন নীতির ফলে মূলধনী পণ্যের আমদানি অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে BHEL, H.M.T., H.E.C. ইত্যাদি সংস্থাগুলির দক্ষতাবৃদ্ধি তো দূরের কথা বরং উৎপাদিত মূলধনী পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে উৎপাদনক্ষমতার একটি বড়ো অংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। আর-একটা বড়ো প্রশ্ন হল, সাধ ও সাধ্যের। ভাবা গিয়েছিল, উদার আমদানি নীতির ফলে রপ্তানি-শিল্পগুলি তাদের পণ্যের গুণগত মান বাড়াতে এবং উৎপাদন-ব্যয় কমাতে সক্ষম হবে, বিশ্বের বাজারে আমরা আমাদের পণ্য-বিক্রয় বাড়াতে পারব। কিন্তু ৮০-র দশকে শিল্পোন্নত দেশগুলির দিক থেকে সংরক্ষণ-নীতি ও সেই সঙ্গে বিশ্বের বাজারে মন্দা আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির পথে এক বড়ো বাধার সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠানো অর্থ—যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়াত—তাও কমে আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে ঘাটতি তীব্র হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, চলতি খাতে বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫৯২৭ কোটি টাকার যা তার আগের বছরের প্রায় দ্বিগুণ। এতদিন পর্যন্ত আমরা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছি এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়টি সাধ্যের মধ্যেই থেকেছে। কিন্তু লেনদেনে ঘাটতি যদি চলতেই থাকে এবং তার কোনো আশু সমাধান না থাকে, তাহলে আরো বেশি ঋণ গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হব। অন্যদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের প্রবাহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান পরিবেশে শুকিয়ে আসছে। চীন ও আফ্রিকার গরিব দেশগুলি সহজ শর্তে ঋণের অন্যতম দাবিদার। এই অবস্থায় উচ্চ সুদের হারে বিশ্বের বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ আমাদের দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশের (যেমন ব্রাজিল, মেকসিকো) মতো ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলবে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নতুন আর্থিক নীতির ফলে আয়বণ্টনে বৈষম্য বাড়বে। সম্পদকর হ্রাস করা, ইসটেট ডিউটি তুলে দেওয়া, আয়করের হার কমিয়ে ফেলা—এসব থেকে উচ্চবিত্তের মানুষ বেশি লাভবান হবেন। অবশ্য আয়করের হার কমানোর সঙ্গে-সঙ্গে যদি কর ফাঁকি বন্ধ করা যায় তাহলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। বরং পুরনো আয়করের অতি-উচ্চ হার একদিকে একজন সৎ দক্ষ বিনিয়োগকারীর উদ্যমের পথে বাধা হিসাবে কাজ করত, অন্যদিকে অতি-উচ্চ করহার কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়াত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকারি নীতির ফলে উচ্চবিত্তের মানুষদেরই পোয়াবারো। কোমপানি-গুলিকে হোটেল, বিজ্ঞাপনের খরচ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি অবশ্যই দৃষ্টিকটু ভোগের বহর বাড়াবে। রঙিন পত্রপত্রিকার ছয়লাপ, পাঁচতলা হোটেলের রমরমা, বহু উচ্চবিত্তের বাড়িতে রঙিন টিভি আর ভি. সি. আর. একটা চোখধাঁধানো সমৃদ্ধির মিথ্যা আবরণ তৈরি করতে পারে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আর্থিক উন্নয়নের সুফলটুকু যেন শুধু ১০ শতাংশ মানুষের কাছেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবে। কোনো সংস্কারই যন্ত্রণাহীন হতে পারে না। যে-কোনো আর্থিক নীতির অনুসরণই একটি কায়েমি স্বার্থের জন্ম দেয়। নীতির পরিবর্তন এই কায়েমি স্বার্থকে আঘাত দেবেই, এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসবেই।

বিনয়কুমার সরকার
প্রসঙ্গে
ভবতোষ দত্ত

তিরিশের দশকের মনস্বী সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকারের জন্ম ১৮৮৭ সালের ২৬ ডিসেমবর। সেই হিসাবে তাঁর জন্মশতবর্ষ শুরু হচ্ছে এই মাস থেকে। বিনয়কুমার সম্বন্ধে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্তের একটি নিবন্ধ আমরা অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারলাম না। রচনাটি "চতুরঙ্গ"-র পরবর্তী সংখ্যায়—১৯৮৮ সনের জানুয়ারি সংখ্যায়—প্রকাশিত হবে।

‘চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর’

বিরাম মুখোপাধ্যায়

কামরূপ-কামাখ্যা মন্দিরে পায়রাপুজোর প্রথা
বিগত ; প্রাচীন পীঠস্থানে অলৌকিক রজোরক্ত-
সিক্তবস্ত্রে স্নানাঞ্জলি ফাঁকিবাজি ; সাধ্বী প্রকৃতিতে
এখনো প্রচল অম্বুবাচি। লুব্ধ জিহ্বার তাগিদে
পায়রার মাংস উপচার,—বাঁকাচোখ তীর্থকাক
পাণ্ডা-পূজারীরা ছুঁদে পেট্রো-ডলারের দালালের
কান ম'লে ছ্যায় ; দস্তুর ও দক্ষিণান্ত চুকেবুকে
যজমান পরিতৃপ্ত পক্ষীমাংসে কোল্‌সটোরাল
রাঙায় না চোখ। মারদাঙ্গা অথবা শান্তিতে তার
—পায়রার—ক্ষান্তি নেই ; রক্তাক্ত ডানায় পড়িমরি
দূতিয়ালি শতাব্দীর সায়াহ্নের নক্ষত্রসভায়
সংহারের শলাপরামর্শে সে প্রতীকী মিশাইল।

নোটন নোটন পায়রারা বস্তুত ঝোঁটন আর
নাচাবে না সমতলে বকুম বকুম—বায়ুস্তরে
বারুদের গন্ধের আবহ ফিনিক ফিনিক ঝরে ;
ভুলি নি সিন্ধুর লুপ্তি, পুঞ্জপুঞ্জ বিষণ্ণ মেঘের
অমেহুর ক্যারাভান ফিরোজা আকাশ ও মরুর
রসাতলে বিস্ময়ের হরপ্পা ও তক্ষশিলা খুঁড়ে-
খুঁড়ে কুরুক্ষেত্রে পানিপথে ঠাঁইনাড়া কালান্তর
ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ভাস্কর্যের
কলাকৃতি, পেলে গোমেদও গেলে, গিলোটিন পোক্ত
নৃশংস জল্লাদ—প্রেতকুণ্ঠে ন্যুজ ; ব্যাঙেজে ব্যাঙেজে
আয়োডিন-গন্ধ পচা পুঁজ হিরোসিমা নাগাসাকি
নিরাময় শুশ্রূষা পেল না, পথ্যে বিষ-বিবমিষা,
আরোগ্যভবন নেই শিলান্যাসে বাজেট ফতুর,
চড়া-সুদে জঙ্গী অস্ত্রে দুঃস্থ রাষ্ট্র আত্মরক্ষা করে।

সৃষ্টির আদিম ইচ্ছা অকৈতব হিতৈষণা, হিংটিং
ছট্ শৈশব-ভোলানো কিমাকার ব্যঙ্গ উচ্চারণ—
সুসংবেদ্য অনুভূতি সাবালক সভ্যতার দান
ক'জন অর্জন করে বাঁচার সংগ্রামে চিরঞ্জীব
উত্তরাধিকার ? বেআক্কেল আলস্যে ব্যায়াম নয়

কবি ও শিল্পীর সিদ্ধি—আগুনের শিক সেঁকা দিক,
বিবেক সর্জনে সহজের পন্থা নয়—মরমিয়া
চিরপ্রতিনিধি প্রাণদ রঙের ; রক্তের খর্পর
শূন্য। এ-সৃষ্টির সাবলীল নীল-সবুজ বিন্যাস
ধ্রুব ধ্যেয় গের্নিকার ‘চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর’॥

স্বাপ্নিকের মৃত্যু

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

পায়ের পাতায় বিঁধেছে তোমার কাঁটা
তুমি যাবে দূরে যাবে দূরে যাবে দূরে
তোমার জন্যে মাঠে বিনষ্ট ধানেরা বিছায় বুক
তোমার জন্যে শ্যামলী নদীর হৃদয় ফেটেছে রোদে
চোখের সামনে ধূ ধূ বালুকার মৃত্যুতে ভরা চাঁদ

তোমার দুচোখে স্বপ্নেরা ছিল ভরা যুবতীর ক্রোধ
যেহেতু পৃথিবী খাবলে খেয়েছে ক্ষুধিত বাঘের নোখ
তুমি যাবে দূরে যাবে দূরে যাবে দূরে
তোমার জন্যে গোহালে বাছুর দুধের তৃষ্ণা ভোলে
তোমার জন্যে মেঠো ইঁদুরের দাঁতেরা শানায় ছুরি
কৃষকের চোখে নষ্ট ধানের শীষের বানানো ফাঁদ

পায়ের পাতায় বিঁধেছে তোমার কাঁটা
তুমি যাবে দূরে যাবে দূরে যাবে দূরে
তোমাকে খেয়েছে তোমার স্বপ্ন-পথিকের উদ্যম
নমিত গমের পূর্ণ খোয়াব বুকের পাঁজরে নিয়ে
ঘুমহীন চোখে হেঁটে যাও তুমি কালের হালট ধূ ধূ
হৃদয়ে রক্ত, জামায় ঘামের চন্দন-কর্দম

তুমি যাবে দূরে যাবে দূরে যাবে দূরে
কতটা দূরের স্মৃতির গোহালে ঝরে দুধ যেন আঠা
যেখানে বাঘেরা ভুলে যায় প্রিয় নরমাংসের স্বাদ
শিশুর চোয়ালে চুমু খেয়ে যায় পুষ্ট স্তনের বোঁটা
সিংহ-পাড়ার নীল বুনোঘাসে হরিণেরা খেলা করে

তোমার মৃত্যু দিয়ে যাবে শুধু স্বপ্নের চোরাবালি
তোমার পায়ের পাতায় বিঁধেছে গোলাপের ভুল কাঁটা
তোমার জন্যে ভিস্তিঅলার মশকে শুকোবে জল
তোমার জন্যে শূন্য বাটিতে জমা হবে লাল ক্রোধ
খঞ্জ পথিক উধাও চরের ভ্রান্তিতে দিশাহারা
তোমার কাফনে কর্দমমাখা পায়ের স্বপ্ন মোছে

তুমি যাবে দূরে যাবে দূরে যাবে দূরে

বাংলাদেশ

অপর্ণা আর মল্লিকা

কামাল হোসেন

একটি লতানে গাছের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে
অনেক দিন অনেক রাত ধরে
একটি শাদা ফুলের কুঁড়ির
জন্ম দেওয়ার জন্য সে অতিক্রম করছিল
জন্ম-জন্মান্তর

ফুলটা ফুটেছিল কিংবা ফোটে নি
বোঝবার জন্য কেউ কখনো আঁজলা ভরে
তুলে আনে নি ভাসমান আলোর কণিকা

এই বিপুল প্রতীক্ষা আর শব্দহীনতার
অনন্ত আয়োজন
অতিক্রম করে ঠিকই জন্ম থেকে জন্মান্তরের বেহালায়
সুর ওঠে সুর গলে সুর যায় বহে—
অপর্ণা আর মল্লিকা নিজেদের ভূমিকা পালটায়
প্রতি দিন প্রতি রাত প্রস্তুতিহীন
ভারহীন স্মৃতির মতো, স্বপ্নের মতো,
যেমন রূপকথায়

বৃদ্ধ যুবাকে ডেকে

স্বপন রায়

বৃদ্ধ আজ যুবাকে ডেকে প্রায়শই ধমকান :
অর্বাচীন, ভোগ করো
ছুটে চলো অশ্বের মতন

বৃদ্ধের আফসোস—
বড়ো সুখের যৌবন ছিল তার
সাদামাটা প্রেম ছিল, সহজ স্বপ্ন ছিল
আর ছিল আটপৌরে স্মৃতি
ঘাম ছিল, স্রাব ছিল
ছিল তার লবণাক্ত স্বাদ
আর ছিল কামনায় গাঢ় নীল নাক্ষত্র-আকাশ।

এখন বৃদ্ধের সাড়ে তিন হাত মাটির শরীরে
কিলবিল করে শুধু চেতনা-বীজাণু
তিল-তিল করে ঝরে যন্ত্রণার কষ
অবশ্য মাঝে-মাঝে ডুব দেয় ডুবুরি মনন
কুড়ায় ঝিনুক,—চলে মুক্তোর সন্ধান
তবু সব ঝিনুকে কি আর মুক্তো পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ যুবাকে ডেকে প্রায়শই এ বুলি শেখান।

তন্মাত্র

সুভাষ ঘোষাল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বহুদিন আগে এক রাতে একটা অদ্ভুত শব্দে আমরা সবাই জেগে উঠি। সবার আগে জেগে গিয়েছিলেন পিসিমা। তিনি তাঁর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উঠোন-থেকে-উঠে-আসা শব্দের কারণ জানতে গিয়ে এমন কিছু দেখতে পান যাতে তাঁর মতো সাহসীরও প্রতি-বন্ধকতা আসে। তিনি আর দরজা খুলে বেরিয়ে না এসে জানলার সামনে থেকেই চিৎকার করতে থাকেন —নিবারণ, ও নিবারণ, শীগগীর ওঠ। উঠে ছাখ এ আবার কোন্ আপদ। বাবার ছপাশে আমি আর বুবুন ছিলাম। মা সে খাটে ছিলেন না। সরু এক-ফালি কাঠকে কিভাবে যেন প্রায় খাট করে একজনের উপযুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। মা সেই ক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তেন। পিসিমার ডাকে শুধু তো বাবা নয়, আমরা সবাই জেগে উঠেছিলাম। তখনই শুনতে পেলাম আমাদের লম্বা এবং সরু বারান্দা জুড়ে, আমাদের ছোট্ট উঠোন জুড়ে কিছু একটা উড়তে না পারার শব্দ করছে। মনে আছে, শব্দের মধ্যে অবিশ্রাম অস্থিরতা ছিল। বাবা দরজা খুলে ছুটে বারান্দায় চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু এতে মার তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন বাবা প্রথমে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে তারপর দরজা খুলুন। বাবা বিরক্ত হয়ে জানলার সামনে গেলে আমিও খাট থেকে নেমে পড়ি। বুঝতে একটু সময় লেগেছিল যে, যে-বিরাট খেচর বারান্দা থেকে উঠোনে এবং উঠোন থেকে বারান্দায় হেঁটে-হেঁটে মাঝে-মাঝে উড়ে যাবার চেষ্টা করে প্রসারণজনিত সমস্যায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সে একটা শকুন। অদূরবর্তী যে গঙ্গা তার ওপরের সেতুর চূড়া থেকে অথবা সামনের ছুটি নারকেল-গাছের উচ্চতম অবস্থান থেকে সে ভুল করে ঝরে পড়ে-ছিল। বাবার জানলার দিকে এবং পিসিমার জানলার দিকে সে এত বিচলিত হয়ে ছুটে আসছিল যে মনে না হয়ে পারে নি সে আক্রমণোদ্যত। আর শকুনকে

যখন তেড়ে আসতে দেখা যায় তখন যে ভয়ের জন্ম হয় সেই ভয় বাবার মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা তক্ষুনি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ার কথা আর না ভেবে ঘরের ভেতর থেকে একটা লম্বা লাঠির মুখ বাইরে রেখে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক-দিকে ডানা ঠিকমতো মেলে দিয়ে উড়ে চলে যাবার চেষ্টা, অন্যদিকে লাঠি ঠুকে-ঠুকে প্রতিরোধ করে যাবার চেষ্টা বহুক্ষণ ধরে চলেছিল। এক সময় সফলতা এল অকস্মাৎ। আমরা সবাই দেখলাম সেই কৃষ্ণ এবং বিরাট অস্থিরতা ঊর্ধ্বের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভোরের আলোয় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল খেচর হয়ে পড়েছিল কতটা ভয়াচ্ছন্ন। উঠোনে এবং বারান্দায় প্রচুরভাবে পড়ে থাকা মলমূত্রকে আমরা অস্বীকার করতে পারি নি। বলা যায় ইংরেজি সূত্র ধরে এসে পড়া আমার সেই জন্মদিন থেকে শুরু হল বিপন্নতার সঙ্গে বিপন্নতার যুদ্ধ।

অসময়ে ছাদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপর্ণা যেদিন বোঝাল—আমার খুব ভয় করছে, তুমি এবার একটা কিছু করো—আমি তার পরের দিন দুজন মানুষকে মা-বাবার কাছে যাবার জন্য উদ্দীপিত করি। একজন অংশুময়। আমার সমাধ্যায়ী। আমি যে ছোটো কাগজটি বহুদিন ধরে বের করে আসছি তার বড়ো স্তম্ভ। তার অধ্যাপক পিতাকে আমি বহুদিন মোমের শিখার সামনে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তিনিই প্রথম আমাকে তাঁর একতলার প্রায়ান্ধকার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—একটা কথা তোমাকে বলি। ইচ্ছেশক্তি একটা খুব বড়ো ব্যাপার। একজন সেই শক্তির সাহায্যে পাহাড়-কেও নড়িয়ে দিতে পারে।—তিনি মাঝে-মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতেন—নালীক, কী বলেছিলাম মনে আছে তো? তাড়াহুড়োর কী দরকার, সব সময়ে খুব সাবধানে রাস্তা পার হবে। আর কখনও মুখে-মুখে আঁক কষবে না। অঙ্ক করবে কর গুনে-গুনে।—তাঁকে দেখেছি রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে। এদিক ওদিক ছদিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিতেন। দূরে কোথাও গাড়ির চিহ্ন দেখতে পেলে তিনি পার হবার জন্য এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন। যতক্ষণ না সেটি দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যায় তিনি ততক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন অনির্বাণ মগ্নতা নিয়ে। আমাদের ছোটো পত্রিকাটি বের হলে অংশুময় যে-যে জায়গায় পত্রিকা পাঠানো দরকার সেইসব অজস্র ঠিকানা নিয়ে সারা বিকেল ধরে একটি আচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে। প্রথমে ছোটো পত্রিকার বড়ো-বড়ো ভুলগুলিকে সে ঝরনা-কলম দিয়ে সংশোধিত করে দেয়। তারপর এক-এক করে ঠিকানা লেখে ছাপানো খামের ওপর। প্রতিটি খামের মধ্যে প্রতিটি পত্রিকা ঢুকিয়ে দিয়ে সে যখন ধূমপান করে তখন অস্তাচলগামী দিনেশের ব্যাপ্তি-কণিকা থেকে তাকে পৃথক করে নেবার সুযোগ খুব কমই থাকে। এমন এক মহামিশ্রণক্ষণে আমি তার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করি। তাকে রাজি করাতে কোনোরকম কষ্ট পোহাতে হয় না।

আমার দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন যথার্থ স্মৃতিভাণ্ডারী। তাঁকে দিয়ে প্রতি সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় লেখাতে পেরে আমরা গর্বিত থাকার সুযোগ পেয়ে গেছি। তিনি তাঁর রচিত এবং পঠিত গ্রন্থ থেকে সরে গিয়ে মাঝে-মাঝে নিগ্রন্থ হয়ে যাবার ভাবনা পোষণ করেন। তাঁর কাছ থেকে যেসব লেখক একসময় বহুভাবে উপকৃত হয়েছেন তাঁর কয়েকশো গজের মধ্যে তাঁরা কখনও ভুলেও এসে পড়েন না। তিনি ভোরের দিকে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁরই এক উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মতো। বাজারে যাবার আগে কখনও চলে যান লম্বা জলফালির দিকে। কখনও গঙ্গার পাড়ে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ধবলতম চূড়ার দিকে। কখনও তেমন কোনোদিকে নয়, এদিকে-ওদিকে যেখানে-সেখানে। যেদিন আমার কাছে এসে পড়েন আমি হয়তো তখন বিছানা ছাড়ার আগে শেষবারের মতো তাকে আঁকড়ে ধরেছি। 'নালীক, নালীক'—এই ডাক তমোভাব নষ্ট করে দেবার পক্ষে

যথেষ্ট হয়ে থাকে। উঠে এসে আমি হয়তো বলি—আসুন উপানন্দদা, ভেতরে আসুন। তিনি কোনো একটা যোগ্য কারণ দেখিয়ে ভেতরে এসে বসার মতো সময়ের যে অভাব আছে তা জানান। আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির গলির মাথায় দাঁড়িয়ে তাঁর অনেক ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন। যেমন তাঁর সংগ্রহ থেকে এনে পড়ে ফেলা তাঁর অনেক প্রিয় বই তিনি আমাকে চিরতরে দিয়ে দিতে চান। 'চিরতরে'—শব্দটিকে তিনি এত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন যে ফুটে উঠতে থাকে কোনো এক রঙ যা ঠিক গোধূলির সমধর্মী। আমার উৎসাহ জাগে। আমি হয়তো কী কী বই পাওয়া যেতে পারে তার তালিকা শুনতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কোনো আত্মদীপ্ত সংস্কারকের নিজের লেখা জীবনীর কথা তিনি আমাকে বলেন। বইটি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে এর আগে যখন পড়ি তখন নানা কারণে বিমুগ্ধ করেছিল। লেখক ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে বহু ক্ষেত্রে পৌঁছে যেতেন। তাঁর বাড়িতে কয়েকজন ক্রীতদাসদাসী ছিল। বারো টাকায় একজন দাসীকে তার দুই ছেলে এবং এক মেয়ে সমেত কিনে নেওয়া হয়। আর পুজোর সময় মহিষের বিক্রমের বর্ণনা আছে। তার চার পায়ে দড়ি বাঁধা হয়েছিল। দড়ি বাঁধা হয়েছিল তার গলায়। তার ঘাড় কলা দিয়ে মর্দন করা হয়েছিল। অনিচ্ছুক মহিষকে সমবেত সবাই ধরে নিয়ে হাড়িকাঠে আটকে দিয়েছিল তার গলা। কিন্তু সে প্রচণ্ড বিক্রমে এক-সময় হাড়িকাঠসহ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। উপানন্দদা যেদিন ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাঁর বাঁয়া আর তবলা চিরতরে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেদিন তাঁকে রাজি করাতে আমার কোনোরকম কষ্ট হয় নি। কারণ ভোরবেলার আত্মোন্মোচন আর যাই হোক দুর্বল হয় না।

অংশুময় যখন মা-বাবার কাছে গিয়েছিল তখন উপানন্দদা যান নি, এবং উপানন্দদা যখন গিয়েছিলেন তখন অংশুময়ের দৌত্য শেষ হয়ে গেছে। দুজনকেই ভারী মন নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। দুজনের কেউ-ই তাঁদের বোঝাতে পারে নি যে ফল উচ্ছিষ্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষ কখনও উচ্ছিষ্ট হতে পারে না। এই ব্যর্থতার ঠিক পরে আমি কিছু-কিছু কাজ সেরে ফেলার জন্য শান্ত থাকার চেষ্টা করি। একদিন মধ্যাহ্নে এক মধ্যবয়স্ক পুরুষকে অধিক অর্থের বিনিময়ে অপর্ণাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হলে তিনি আইনের শক্তিতে আমাদের দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে যান কয়েক মিনিটের মধ্যে। একদিন আবিষ্কার করি বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট দূরে নতুন স্টেশন হয়েছে। গভীর রাতে যে গাড়ি শিশ দিতে-দিতে একটি অলৌকিক প্রভাব রেখে-রেখে চলে যেত সে এবার থেকে বাড়ির কাছে থামছে। সেই থেমে যাবার সুযোগ নিয়ে আমি কয়েক স্টেশন ছাড়িয়ে একটি বাড়িও দেখে এলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে। একেবারে নতুন বাড়ি। ভাত খেয়ে উঠে সুপুরি মুখে নিয়েও আসন্ন ট্রেন ধরে ফেলা যায়। এমনই নৈকট্য যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল অপর্ণা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েও দেখতে পাবে আমি ট্রেনে উঠছি এবং তেমন প্রয়োজন হলে সে রুমাল নাড়াতেও পারবে। বাড়িটার ঘেরা বারান্দায় ঘরের বিস্তৃতি আছে। কিন্তু জলের বন্দোবস্ত তখনও হয় নি, আলোর বন্দোবস্ত হয়েছে। বাড়ির মালিক তরুণ। অফিস থেকে ধার নিয়ে বাড়ি করেছেন। তাড়াতাড়ি জলের বন্দোবস্ত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অপর্ণাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলাম। সে খুব খুশি। শোণিমাকে বললাম—চলো দেখে আসবে। সে ঠিক রাজি হল না।—তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হওয়াটাই বড়ো কথা। আমি পরে যাব। তোমরা গুছিয়ে বসো, তারপর এত যেতে থাকব যে বিরক্ত হবে।—এক রোববার বিকেলে গিয়ে তরুণ মালিকের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি সহাস্য হলেন।—আপনারা আসবেন, এদিকে জল নেই। আমি তো বেশ চিন্তায়

পড়েছিলাম। যাক সে সমস্যা মিটিয়েছি। এবার চলে আসতে পারেন। সদ্যখনিত পাতকুয়োর মুখ ঢাকা ছিল। সেদিকে একবার গিয়ে ঘুরে এলাম। বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম তার পরের দিন থেকে কিছু-কিছু বই, কিছু-কিছু জিনিস, কিছু-কিছু কিনে কিছু সংগ্রহ করে নতুন বাড়িতে রেখে আসব। এই চলে যাবার কথা রাতের থমকে-যাওয়া আবহাওয়ায় ঘুরে-ঘুরে আমাকে অত্যন্ত খালি করে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি আলমারি খুলে তাক থেকে বই নামাতে শুরু করে দিলাম। আমার ভাত ঢাকা থাকত। প্রতিদিন বাড়ি ফিরলে সাধারণত বুবুন দরজা খুলে দিয়ে চলে যেত। তাকে আর আমার আশেপাশে কোথাও দেখতে পেতাম না। সে নিশ্চয়ই সেই অন্ধকার ঘরটিতে চলে যেত যেখানে তার বহু আগে বাবা-মা গিয়ে বসে বা শুয়ে থাকতেন এবং আমি আসার পর থেকে কোনো রকম শব্দ শোনা যেত না। সেদিন বই নামাচ্ছি আর অনেক বই নামানো হয়ে গেছে সশব্দে। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ছিন্নপত্র', 'মহাকাশপরিচয়', 'যাদু-কাহিনী' সব একাকার হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। একটু আগে দেখে এসেছি অপর্ণীদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত অখণ্ড এবং মণ্ডলাকার নক্ষত্র-ব্যাপ্তি। একটু আগে শুনতে পেয়েছি প্রতিবেশীদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার নানা আওয়াজ। আমার পেছনে অনেক পদশব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি অন্ধকার ঘর থেকে গ্রন্থের ঘরে একে-একে উপস্থিত বাবা-মা-বুবুন। মা আমার নামানো বইগুলির পাশে বসে পড়লেন। বুবুন ঘরের একেবারে শেষদিকের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বাবা? বহু যুগ আগের রাত্রিতে বিমান থেকে বানিয়ে তোলা দিবা-লোকে শব্দের প্রলয় ঘটে যাবার পর বড়ো বিবর থেকে নির্গত হয়ে মৃত বন্ধুদের সামনে যে জলময় চক্ষু রেখেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি সে-রাতে বাবার মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি ছিল। তিনি আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখলেন। হাতে আলিঙ্গন ছিল। আমি চাইছিলাম হাত আরো একটু উঠে গিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করুক। তখনই তিনি উচ্চারণ করে উঠলেন—কোথায় যাবে তুমি? আমরা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।—তাঁর উচ্চারণে আমি এই প্রথম দেবনাগরীর স্পর্শ পেলাম। ফলে পিসিমার এই ঘরে আমার অপরিহার্যতার সূত্রে অপর্ণী চলে এল কৃষ্ণাপক্ষমীতে।

রাত কত হল জানি না। টেবিলের ওপর বিয়েতে পাওয়া ঘড়ি আছে। বিছানায় দেহ সংকুচিত করে দেয়ালের দিকে যে তাকিয়ে থাকে তার কাছে টেবিল খুব একটা কাছের ব্যাপার নয়। এবার কিন্তু তাবৎ মানবিক সম্পর্কের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া গালাগালির আওয়াজ বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তার মানে রাতের মধ্যে এসে পড়েছে যথেষ্ট বয়স। কেউ কোথাও যখন আর জেগে থাকে না তখনই তো পাগলী চিৎকার করতে বাধ্য হয়। এক মাস ধরে দেখছি আমাদের বাড়ির সামনের পথে এই চল্লিশোত্তর নারী চুল ছেড়ে দিয়ে সারা দিন সারা রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। কাদের বাড়ির বউ, কাদের বাড়ির মেয়ে, কোন্ বস্তির সম্পদ—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। আমি যতবার তার পাশ দিয়ে গেছি তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। সিথি সিঁদুরে আচ্ছন্ন করে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। পিসিমাকে উপকথা বলার সময় এমনই নিরুদ্বিগ্ন দেখেছি। সে কী খায় তা নিয়ে ভাবি না। অন্তত তিন-চারটে বাড়ি আশেপাশে আছে যেগুলির ভিতর থেকে যুবতী আর বৃদ্ধারা বেরিয়ে এসে উচ্ছিষ্ট উপুড় করে দিয়ে যেতে পারে রোজ। আমি ভাবি তার সিঁদুর নিয়ে। আমি যখন অফিসে থাকি সে নাকি কোনো এক সময় তখন একবার করে রোজ উঠে এসে পথের কলে স্নান সেরে নেয়। তারপর তার আসনে ফিরে গিয়ে গভীরভাবে সিঁদুর পরে। এই কাজটি না করা পর্যন্ত তাকে প্রদত্ত

সব উচ্ছিষ্ট সে হেলায় সরিয়ে রেখে দেয় একপাশে। প্রতিদিনই পাশের বস্তির ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা তাকে বিরক্ত করার সুযোগ খোঁজে। তখন সে চিৎকার করে থাকে ঠিকই, তবে তা ক্ষণায়ু। কিন্তু তার এই শর্বরীশব্দ নিরবচ্ছিন্ন আর আয়ুষ্মান। প্রথমে ভেবেছিলাম রাতের কুকুরের সামনে আমাদের চোখে পড়ার মতো কোনো কিছু না থাকলেও সে যেমন ডেকে যায় এ-ও হয়তো তেমন কোনো রহস্যময় ডাক। এই ধারণা আমার কাল সন্ধে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু কাল রাতে অপর্ণী আমার সে ধারণা ভেঙে দিয়েছে।—জান কাল কী হয়েছে?

—কী হয়েছে?

—মিতুনের মা বলছিল। ওদের বাড়ির জানলা দিয়ে সব দেখা যায়। কাল পাগলীটা অসম্ভব চিৎকার করছিল। মিতুনের মা জানলা খুলে ছ্যাখে……এই পর্যন্ত বলে থেমে যাওয়ায় আমি অপর্ণীর মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালাম। সেখানে ঘন লজ্জা।

—কী হল, বলো!

—ছ্যাখে একজন হাত ধরেছে, একজন পা ধরেছে। আর একজন যা করার তাই করে যাচ্ছে। শোনার পর থেকে আমার এত খারাপ লাগছে কী বলব।

চণ্ডীতে রাত্রিসূক্ত আছে। রাত্রিদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য এমন সব কথা বলা হয়েছে যা আজও আমাকে স্পর্শ করে যায়। রাত্রিদেবী আসছেন। আসতে-আসতে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা অর্থাৎ নক্ষত্রের চোখ দিয়ে সমস্ত বিশ্ব তিনি দেখে যাচ্ছেন। মরণরহিত এবং নিত্য হয়ে তিনি বিস্তীর্ণ আকাশকে পরিব্যাপ্ত করছেন। ছোটো-ছোটো লতাগুল্ম এবং উঁচু-উঁচু বৃক্ষকেও তিনি ঢেকে দিচ্ছেন। প্রথম শয্যাসাক্ষাতে তিনি অপর্ণী এবং আমাকেও আবৃত করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুগ্রহের শেষ নেই।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥

রাত্রিদেবীর দয়ায় গ্রামবাসীরা, গো-মহিষ প্রভৃতি পশুগণ, পক্ষিসমূহ, কামার্থিগণ এবং শ্যেন পাখিরাও সুখে শয়ন করে। শরীরেরও স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আছে—এই অনুভব রাত্রির অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া বুঝতে পারতাম না। একসময় আমি খুব ভয়ে-ভয়ে পাতালের দরজায় হাত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। আগাগোড়া চোখ খোলা ছিল বলেই বুঝতে পেরেছিলাম কেন এই দরজাকে দেখে অপরাজিতা ফুলের কথা উচ্চারিত হয়েছে। চোখ আগাগোড়া বন্ধ রেখে আমি যেবার ফুল স্পর্শ করি সেবার ছিল দুর্গাপুজোর ছুটি। আমার অবসরপ্রাপ্ত পিতৃব্যের তিনঘরের কমলা একতলার পেছনদিকে ভোরবেলায় দাঁড়ালে পুকুরের পাশে জঙ্গম জবা দেখা যেত। পুকুরের অন্যদিকে ছিল শ্বেতপাথরের দোতলা। তার ছাদের ঘরে উঠে যাবার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। দুহাত দিয়ে আনত জবা সরিয়ে-সরিয়ে পথ করছি। কাছেই আধা-সামরিক বাহিনীর পাঁচিল। প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজের বাজনা পাখিদের উড়িয়ে দিচ্ছিল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে যে সাজি হাতে নেমে আসছিল সে ছিল শ্বেতপাথরের দোতলার মূল রমণী। বাগানে নেমে সে যখন জঙ্গম জবার দিকে ধাবিত আমার আট-দশ বছরের চোখে তাকে ফুলের থেকেও প্রস্ফুটিত দেখিয়েছিল। ফুল তুলতে-তুলতে সে আমার নাম জানতে চেয়েছিল। নাম শোনার পর তার প্রশ্ন ছিল—তুমি জান নালীক মানে কী?—আমি বাবার কাছ থেকে শিখে নেওয়া আমার নামের অর্থটি সহজেই শোনাতে পেরেছিলাম।—নালীক মানে নল-লাগানো একরকমের অস্ত্র। অনেক আগের মানুষেরা এটা ব্যবহার করতেন।

—তোমার নামের আর-একটা মানে আছে। সেই মানেটা জান?

—আর-একটা মানে আছে নাকি? আমি জানি না তো।

—নালীক মানে মৃণাল। মৃণাল মানে পদ্মের ডাঁটা। তুমি পদ্ম দেখেছ তো?

—হ্যাঁ, আমি দু-একবার দেখেছি।

—আমার নাম কী বলো তো?

—কী?

—আমার নাম ভূমিকা। ভূমিকাদি বলতে অনেক সময় লাগে। তার চেয়ে ভূমিদি বললে অনেক কম সময় লাগবে। তুমি আমাকে ভূমিদি বলবে, কেমন? প্রথম দিনই ভূমিদির সঙ্গে গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে আমি শ্বেতপাথরের দোতলায় প্রবেশ করেছিলাম। ভূমিদি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমাকে সবকিছু দেখিয়েছিল। বড়ো-বড়ো ঘর, বড়ো-বড়ো জানলা, বড়ো-বড়ো দিবালোক, আর বড়ো-বড়ো নৈঃশব্দ্য। একটা ঘরে টেবিল-টেনিসের বোর্ড ঘর-জোড়া। আর-একটা ঘরে সংগীতের নানারকম সরনজাম। আর-একটা ঘরে ভূমিদির বিছানা। ভূমিদি যেদিকে মাথা রাখে সেদিকের জানলা দিয়ে জবার যাবতীয় জগতে পৌঁছে যাওয়া যায়। দেখা যায় পুকুরে নেমে যাচ্ছে রাজহংসের দল। বড়ো-বড়ো শুভ্রতার সেইসব দোলনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুনে ফেলা যায় প্রতিটি ঘরের টাঙানো ঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসা শব্দশ্রী। আমিও প্রথম দিন শুনেছিলাম এবং শুনে ফেলে কমলা রঙের একতলায় ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।—আজ আসি ভূমিদি?

—এসো। মাঝে-মাঝে চলে আসবে। তোমাকে টেবিল-টেনিস খেলা শিখিয়ে দেব। মাঝে-মাঝে পিতৃব্যের বাড়ি চলে আসার সুযোগ ছিল বলে ভূমিদির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি বহুবার। ভূমিদি কত কিছু যে করত তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ভূমিদি আলতা পরত। নানা রকম কারুকার্যশোভিত একটি বাটিতে আলতা রেখে পালকের মতো নরম এবং কলমের মতো সরু একটি দণ্ড তার মধ্যে ডুবিয়ে নিত। তারপর তার পায়ের পাশগুলি রঞ্জিত করে সে পায়ের পাতার ওপরে একটি বৃত্ত আঁকত। সেই বৃত্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলত আর-একটি ছোটো বৃত্ত। তখন তার দুটি পা সম্পদে পরিণত হত। পাশে বসে দেখতাম আলতা পরার কাজ শেষ হলে পায়ে তোড়া পরত ভূমিদি। এমনও হয়েছে পদসজ্জার পর সে আমাকে নিয়ে টেবিল-টেনিসের ঘরে চলে গেছে। আমার হাতে ব্যাট দিয়ে আমাকে একপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে অন্যপ্রান্তে ব্যাট ধরত ভূমিদি স্বয়ং। মাঝে-মাঝে আমাদের খেলার মাঝখানে চাকালাগানো চেয়ারে করে যাঁকে ওই ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হত তিনি ভূমিদির বাবা। তাঁর সারা শরীর ভয়াবহরকমের সাদা ছিল এবং উত্থানশক্তিরহিত সেই প্রৌঢ় আলখাল্লার মতো একটা পোশাক পরে ভূমিদির সফলতা আর আমার ব্যর্থতা লক্ষ করে যেতেন মন্তব্যহীনভাবে। একদিন বিকেলে পুকুরের সামনে ভূমিদি আমাকে দেখে বলল—তুই তো আজ জেঠার বাড়ি থাকবি। কাল সকালের দিকে একবার আসিস তো। খুব মজা হবে। বলতে-বলতে ভূমিদি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি জানতাম আর-একটু পরেই ভূমিদি তার সংগীতের ঘরে চলে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করবে। রাতের শেষে এবং দিনের শেষে পিতৃব্যের একতলা থেকেই শুনতে পাওয়া যেত ভূমিদির বহুতল গলা। পরের দিন সকালে ভূমিদির বাড়িতে আমার সমবয়সী কয়েকজন ছেলে-মেয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ভূমিদি তার বাবার ঘরে আমাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। তার বাবাকে খাটের ওপর মার্জিত করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ভূমিদি যারা কথা বলছিল তাদের চুপ করতে বলে কথা শুরু করল। —বাবা দেখবেন পলক না ফেলে তোমরা কতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পার। যে পলক ফেলবে সে উঠে গিয়ে অন্য কোনো-দিকে বসে পড়বে। —প্রতিযোগীরা প্রত্যেকে ভূমিদির বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে শুরু করল। ভূমিদি ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে আমাদের লক্ষ করার কাজে শান্ত। মনে আছে কিছুক্ষণ পরপর

এক-একজন করে চুপচাপ উঠে গিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। শেষে এমন হল ভূমিদির লক্ষ্যের সামনে আমিই একমাত্র বসে রইলাম। আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল কাপ দিয়ে।

অপলক দৃষ্টির পরিচয় রাখার কয়েকদিন পরে আমি একটা ক্যামপে যোগদান করি। স্কুল থেকে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয় এমন এক ছোট্ট শহরের কোলে যেখানে ছোটো পাহাড় আছে এবং নদী ছোটো-ছোটো পাথরে সমাচ্ছন্ন। আমরা স্কুল থেকে গিয়ে একটা খুব লম্বা আর বড়ো স্কুলে পৌঁছে বুঝতে পারলাম আমাদের সাতদিন আনন্দে কাটবে। ওই সাতদিন ভোরে উঠে নিজেদের বিছানা নিজেরা তুলে ফেলে মাঠে গিয়ে লাইন করে পা মেলাতাম। বিকেলে অপরিহার্য ছিল সবাই মিলে নানা দিকে ঘুরে বেড়ানো। কখনও আমরা নদীর রাস্তা ধরে হাঁটতাম। কখনও আমরা শহরের দিকে যেতে-যেতে দুপাশে রেখে যেতাম একই রকম দেখতে যত বাড়ির পর বাড়ি। একদিন ওপর থেকে বলা হল, তোমাদের আজ নিয়ে যাওয়া হবে 'দিগ্‌দর্শন'-এ। —'দিগ্‌দর্শন'—সে আবার কী? সারাদিন উত্তেজনায় কাটল। বিকেলে, আমরা যে ডাচসংগীত শিখেছিলাম আমাদের শহরে, সেটি গাইতে-গাইতে এই ছোট্ট শহর ছাড়িয়ে গেলাম। বেশ ফাঁকা জায়গায় টিলা বানানো হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে টিলায় উঠলে সেই গোল টিলায় তীরচিহ্ন দিয়ে-দিয়ে পৃথিবীর কয়েকটি বড়ো-বড়ো দেশের দিক দেখানো হয়েছে। আমরা বৃহতের গন্ধ নিয়ে সেদিন স্কুলে ফিরেছিলাম। কিছু বিশ্রামের পর বেজে উঠেছিল বিউগল। সংকেত পেয়ে আমরা যখন বারান্দায় সঞ্চিত হলাম আমাদের জানানো হল একটু পরে প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কী পরীক্ষা তখনও কিছুই জানি না। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। কে যেন বলে উঠল—এ বড়ো মজার পরীক্ষা, এর জন্য তৈরি থাকার প্রয়োজন নেই।

রাত বেশি হয় নি। একদিকে বড়োরা রান্না করছেন। অন্যদিকে পরীক্ষার আয়োজন শেষ হল। আমি আহূত হয়ে যে ঘরে গেলাম সেই ঘর পরদা দিয়ে বিভাজিত করা হয়েছে। কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু পরদার আড়াল থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ভালো করে শোনো। কতকগুলো শব্দ করা হচ্ছে। তোমাকে বলতে হবে ওগুলো কিসের শব্দ। টুং টাং। টিং টিং। ডুম্ ডুম্। দিম্ দিম্। —এইজাতীয় আওয়াজ হচ্ছিল। সাধ্যমতো বলে যাবার চেষ্টা শেষ হলে পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। পরদার আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমার চোখ বেঁধে আমাকে নিয়ে গেল পরদার আড়ালে। সে আমার কবজি ধরে রেখে বলেছিল—তোমাকে নিয়ে গিয়ে কিছু জিনিস ছোঁয়ানো হবে। তোমাকে ছুঁয়ে দেখে বলতে হবে ওগুলো কী। —মনে আছে আছে আমি তার ছুঁয়েছিলাম, লোহার বল ছুঁয়েছিলাম, কাঁচের গ্লাস ছুঁয়েছিলাম, আর ছুঁয়েছিলাম ধূপকাঠি।

তখন এমনই অবস্থা ছিল সব কথা সমস্ত ঘটনা ভূমিদিকে না শোনালে তার কোনো মূল্য থাকত না নিজের কাছে। ভূমিদি ক্যামপের সব কথা শুনতে-শুনতে আমাকে বলেছিল—সামনের পুজোর ছুটিতে একদিন সকালে এসে সারাদিন আমার কাছে থাকবি। —আমি তার কথা সানন্দে রেখেছিলাম। একদিন ছুটির সকালে পিতৃব্যের অনুমতি নিয়ে চলে এলাম ভূমিদির কাছে। ভূমিদি সেদিন আমার সঙ্গে টেবিল-টেনিস খেলল। ছাদে গিয়ে আকাশ আর পল্লী দেখল। ছাদ থেকে নেমে এসে আমাকে নিয়ে গেল তার স্নানঘরে। সেদিন ভূমিদির পরিচালনায় আমার স্নান শেষ হয়েছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে আমি ভূমিদির শিয়রের জানলা দিয়ে রাজহংসপ্রধাবন দেখছি এমন সময় ভূমিদি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

—নালীক, এখন আমি তোর একটা পরীক্ষা নেব। দেখি তুই পারিস কিনা। পরীক্ষার কথা শুনে

এবং পরীক্ষক ভূমিদি জেনে আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিলাম—কী পরীক্ষা নেবে, ভূমিদি? নাও না, মজা হবে খুব।

সুদৃশ্য কাপড়ের টুকরো দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দিল ভূমিদি। আমি তো উত্তেজনায় ভরে আছি। আমার হাত ধরে ভূমিদি আমাকে নিয়ে এক-এক জায়গায় থামছে এবং হাত বাড়িয়ে সামনের জিনিস ধরতে বলে জিজ্ঞেস করছে—বল্ তো এটা কী? —আমি প্রথমে বাজনার তারে হাত রেখেছিলাম এবং ঝংকার উঠেছিল। তারপর ঘরের আরও অনেক আসবাবে। প্রতিবারই আমার উত্তর শুনে নির্ভুলতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যাচ্ছিল ভূমিদি। পরীক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য আমার চোখ খোলা রাখা হল। ওই সময়ে ভূমিদি কি যথেষ্ট অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছিল? কে জানে, আজ আর সেসব মনে পড়ে না। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবার আগে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হল আমার। ভূমিদির নির্দেশ ভেসে এল একটু দূর থেকে। —আস্তে-আস্তে সামনে চলে আয়। আমি দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে সামনে এগোচ্ছিলাম। থামতে বলল ভূমিদি। থামলাম। —এবার হাঁটু ভেঙে বোস্। —বসলাম। দুটি জানু যখন মাটি ছুঁয়েছে ভূমিদি হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে বলল। আমার করতলে চুলের স্পর্শ পেলাম। —এ তো তোমার চুল, ভূমিদি। —ভূমিদি আমার হাত নিয়ে আর-এক জায়গায় রাখল। —এ তো তোমার পেট ভূমিদি। —সর্বশেষে আমার হাত যেখানে রাখা হল সেটি অত্যন্ত অপরিচিত এবং নরম একটি কেন্দ্র। আমি কিছুতেই কিছু বলতে না পেরে বাঁ হাত দিয়ে চোখের বাঁধন খুলতেই আমার হাত সরিয়ে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ভূমিদি এবং এক ক্ষণপ্রভায় বুঝতে পেরে যাই আমার হাত পাতালের দরজায় সংস্থাপিত ছিল।

আজ সন্ধে-রাতের ট্রেনে অপর্ণা জয়কে নিয়ে শহর ছাড়ল। আফ্রিকা থেকে ছুটিতে এসে তার ডাকতার মামা অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর অসুত কয়েকটি ছোটো-ছোটো ভ্রমণে তিনি অপর্ণাকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেসব সম্ভব হয় নি। এখন জয়ের স্কুল পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে। স্কুলে দিনের পর দিন না গিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর লোভনীয় সব সুযোগ গ্রহণ করতে অপর্ণা সাহস পায় না। সে এই কদিন জয়কে স্কুলে নিয়ে গিয়ে অসুত এটুকু বুঝতে পেরেছে যে মায়েরা কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়ার ব্যাপারটাকে দেখে থাকে আজকাল। কত দূর-দূর থেকে শিশুদের নিয়ে যুবতীরা চলে আসে এবং এসে চলে যাবার কথা ভাবতেই পারে না। তারা সাদা তিনতলা বাড়িতে শিশুদের পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলবদ্ধভাবে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করার কোনো জায়গা নেই। ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে যুবতীরা এদিক-ওদিকের ছোটো-ছোটো বারান্দায় বসে থাকে। যারা বারান্দাতেও জায়গা পায় না তারা দুপুরের অবহেলিত চায়ের দোকানে ভিড় করে। কদিন ধরে কী রোদ, কী তার সহিংস বিস্তার। ঘরের বিছানায় উঠে পুরোদমে পাখা চালিয়েও মানুষ নিজেকে খুব বিপন্ন মনে করছে। তখন এই যুবতীদের কথা ভেবে তারা নিশ্চয়ই প্রেরণা পেতে পারে। কিন্তু কদিন ধরে দুপুরের জমাট দানা ভাঙতে ভাঙতে আমি যখন বাড়ির কাছের অফিস থেকে বাড়ি ফিরি কোনো মাকেই আর দেখতে পাচ্ছি না। কাল সন্ধেবেলায় অপর্ণা জয়ের স্কুলের নোটবুক আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। নোটবুকে কয়েকটি ঘর কাটা আছে। এর আগে জয় একদিন স্কুলে যেতে পারে নি। একটি ঘরে আমাকে লিখতে হবে সেই তারিখ। অন্য ঘরটিতে কেন আসতে পারে নি তা জানাতে হবে সংক্ষেপে। এর পরের দুটি ঘরের প্রথমটিতে আমার স্বাক্ষর এবং পরেরটিতে জয়ের ক্লাস যে নিয়ে থাকে সেই দীপ্ত যুবতীর স্বাক্ষর থাকবে। তার দীপ্তির কথা

অপর্ণার মুখেই শুনেছি। আমি তাকে কোনোদিনও দেখি নি। দেখার প্রশ্নও ওঠে না। যে অফিস যেতে আসতে স্কুলের সামনের রাস্তা শুধু অতিক্রম করে, দাঁড়ায় না মোটেই, তার পক্ষে স্কুলের কাউকে দেখা কখনোই সম্ভব হবে না। কিন্তু স্বাক্ষরের পাশে স্বাক্ষর জমে-জমে আগামী দিনগুলিতে সম্ভব হবে এমন একটি চিত্র যা দাঁড়িয়ে থাকবে কেবলমাত্র যুগলমনস্কতায়। আমার অসতর্কতার মুহূর্তে আমার হাত থেকে একটানে নোটবুক নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল জয়। অপর্ণা ছুটে গিয়ে নোটবুক উদ্ধার করে যখন ফিরে আসে আমি তখন প্রশ্ন রাখি।—অপু, কী ব্যাপার বলো তো? কদিন ধরে জয়ের স্কুলের মায়েদের এদিক ওদিক আর দেখছি না। তারা সব গেল কোথায়?

—স্কুলে নোটিশ বেরিয়েছে, কেউ আশেপাশের বারান্দায় বসে থাকতে পারবেন না।

—কেন, হঠাৎ এই বারণ কেন?

—শুনলাম পাড়ার অনেক বাড়ি থেকে স্কুলের কাছে নালিশ এসেছে।

—তারা তো কোনো ক্ষতি করছে না। খালি বারান্দায় বসে শুধু অপেক্ষা করছে।

—শুধু কি আর অপেক্ষা করে? নানারকম আলোচনা করে, আওয়াজ করে। সেটা হয়তো অনেকের পছন্দ হয় না।

—মায়েরা এখন তবে গেল কোথায়? কোথায় গিয়ে বসছে?

—স্থাখো, এইসব অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমাকে কোরো না। তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় বসছে, কী করছে, কী খাচ্ছে—এসব আমার জানার কথা নয়। তুমি আজকাল বড়ো বেশি বাজে কথা বল। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে লাভ কী?

—তুমি এটাকে অপ্রাসঙ্গিক কী করে বলছ আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। অপর্ণা আমার কথার উত্তর না দিয়ে আমাদের পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

সাত দিনের জন্য সে এই দ্বিতীয় বার সমুদ্রদর্শনে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে রওনা হল। ফিরবে রবিবার সকালে। জয়ের স্কুল শনি-রবিতে বন্ধ থাকে। তার মানে কার্যত পাঁচ দিন জয় স্কুলে অনুপস্থিত থাকবে। এই পাঁচ দিনের অনুপস্থিতিও অপর্ণার কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির কথা ছিল। সবাই মিলে বলাতে সে শেষ-পর্যন্ত মামার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তার দেহের পাতাল স্পর্শ করার প্রথম দিনগুলিতেই আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম বাইরে কোথাও যেতে হলে আমরা দূরের এমন এক সমুদ্রতটে যাব যেখানে কিছু মানুষ নিঃশব্দে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের সংঘবদ্ধ করে দিয়ে গেছে বাইরের কোনো শক্তি নয়, বরং এক আন্তর বিশ্বাস যে কাজই হচ্ছে শরীরের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। কী কাজ সে সম্বন্ধে যাবার আগে আমাদের ধারণা খুব ভাসা-ভাসা ছিল। কিন্তু গিয়ে আমরা বুঝতে পারি অমর্তের মূল্যে মর্তকে সম্মানিত করার কাজ চলছে। অপর্ণার প্রথম সমুদ্রদর্শন বলতে এই যাওয়া-কেই বোঝায়। আমরা দুরাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোর-বেলায় ট্রেন ছাড়লাম। তারপর রিকশা নিয়ে যে বাসে উঠব সেই বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো। বাস খুব দ্রুতগামী ছিল। মাঝরাস্তায় থামলে 'কফি কফি' এই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আমরা কফি খাই। অপর্ণাদের বাড়ির সফেন কফির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বাস যেখানে একেবারে থেমে যায় সেখান থেকে আবার রিকশা নিয়ে এগোতে থাকি। একটা সাদা বাড়ির দরজায় আমাদের রিকশা থামে। ভেতরে গিয়ে জানতে পারি আমাদের বাসস্থান ঠিক হয়েছে একটা ঝকঝকে তিনতলার দোতলায়। একটি বড়ো ঘর। ঘরের ভেতরে জলকলের ঘর আছে। ঘরে খাট আছে, তাক আছে ঘরের দেয়ালে, আর আছে ছোটো টেবিল, ছোটো চেয়ার। দুপুরের স্নান সেরে আমরা দুপুরের খাওয়া সারতে আরও একটা সাদা বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে বিরাট লাইন পড়েছে। সবাই খাবার পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

এবং নেই কোনো শ্রীহীন শব্দ। আমরা কেনা কুপন জমা দিয়ে অনেক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে চলে এলাম সবার সামনে। আমাদের হাতে একজন থালা তুলে দিলেন। একজন ভাত দিলেন, একজন তরকারি, একজন দুধ বা দই। আমাদের খাবার নিয়ে আমরা অন্য একটি ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছিলাম। প্রত্যেকের সামনে ছিল জলচৌকির মতো কাঠের ছোটো-ছোটো আধার। সেখানে খাবার রেখে খেতে গিয়ে দেখেছিলাম আমাদের সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে অজস্র মানুষ কোনো কথা না বলে খেয়ে চলে যাচ্ছে এবং যারা উঠে যাচ্ছে তাদের জায়গায় থালা হাতে করে বসে পড়ছে অজস্র মানুষ। এই যাওয়া-আসার পরিচ্ছন্নতা দেখতে-দেখতে আমাদের খাওয়া শেষ হল। ঘর থেকে উঠে আসতেই দেখলাম আমাদের হাত থেকে থালা নেবার জন্য সুদর্শন মহিলা এবং পুরুষেরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। থালা হাত থেকে হাতে যেতে-যেতে দ্রুত চলে যাচ্ছে বড়ো-বড়ো জলাধারের সামনে। একবার ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় এবং আর-একবার গরম জলের চৌবাচ্চায় থালা মার্জিত হয়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে হাতে-হাতে চলে যাচ্ছে খাবারঘরে আবার। মোটা জলের ধারায় হাত মুখ ধুয়ে এসে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আধার শুদ্ধ করার এই ব্যাপ্তি দেখে দোতলার ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। অপর্ণা সেভাবে জানত না বলে ওকে জানিয়েছিলাম, যাঁরা থালা ভরিয়ে দিচ্ছেন এক-এক করে এবং যাঁরা থালা খালি হবার পর তাকে শুদ্ধ করছেন ক্রমান্বয়ে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সমুদ্রতটে আসার আগে আমরা যাকে প্রতিষ্ঠা বলে থাকি তার শিখরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা যাকে বুদ্ধি বলে থাকি তার অতন্দ্র সব চর্চা করেছিলেন। আমরা যাকে অবিশ্বাস বলি সমাচ্ছন্ন ছিলেন তার গরিমায়।

আমরা বিকেলে একটি বেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হলুদ ফুলের যে গাছ তার তলায় বেদী। বেদীর তলায় এখানকার সমস্ত কিছুকে যাঁরা ভাবে ও কর্মে সংগঠিত করেছেন, যাঁরা পৃথিবীকে অস্বীকার না করে তাকে দিয়েছেন নতুন মর্যাদা, সেই দুজন পুরুষ ও নারীর মরদেহ। কাছেই প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ঠিক পাশে যে শান্ত মহিলা বসে আছেন তিনি অপর্ণার থেকে বয়সে এমন কিছু বড়ো নন। নানা রঙের ত্বক নিয়ে, নানা রঙের পোশাক পরে মানুষের পর মানুষ এসে সেই মহিলার হাত থেকে নেওয়া একটা মোটা আর একটা সরু ধূপকাঠি প্রদীপের শিখায় ধরছে। বেদীর ওপরে গাছ থেকে ফুল ঝরছে এবং মানুষের হাত থেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ধূপকাঠি। কেউ-কেউ বেদী থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে এবং চোখ না খুলে আসীন। বেদী থেকে সমুদ্র বড়ো জোর আমার বাড়ি থেকে আমার অফিস। সমুদ্র মানে শুধু কি নীলিমা, চৈতন্য-বর্ণ নয়? সমুদ্রকে ঘিরে রাখা হয়েছে লম্বা পাঁচিল দিয়ে। পাঁচিলের নীচে কালো-কালো পাথর। ঢেউ এসে কালো পাথর ধুয়ে দিচ্ছে। শুনলাম একটু দূরে জাহাজঘাটা। দুটি জাহাজ কিছুদিন আগেও এসে-ছিল। অপর্ণাকে নিয়ে জাহাজ দেখার ইচ্ছে একবার মাথা তুলে মিলিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র থেকে আমরা সোজা চলে এসেছিলাম খেলার মাঠে। সেখানে ভারতের মানচিত্র টাঙানো ছিল। তার সামনে বেজে উঠল ব্যানড। আমরা বালির ওপর মাদুর পেতে শুনলাম। বালির ওপর মাদুর পেতে দেখলাম চলচ্চিত্র। যখন রাতের দোতলায় ফিরে যাচ্ছি বিপুল বৃষ্টি নামল। একটা আচ্ছাদনের তলায় দাঁড়িয়ে চশমা-পরা এবং স্নিগ্ধ এক বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করে উঠলাম—এখানে কতদিন আছেন?—তাঁর সহাস্য উত্তর ছিল—তা প্রায় চল্লিশ বছর হবে।

তার পরের দিন অপর্ণা আমাদের শহরের অনেকের মুখ মনে করে-করে অনেক কিছু সংগ্রহ করল। আমি পছন্দ করলাম কাঁধে ঝোলানো যায় এমন একটা সবুজ ব্যাগ।

ফেরার পথে ঠিক ছিল সেলাইভবন হয়ে ফিরব। এই সূচীকর্মকেন্দ্র যাঁর অধীনে তিনি গান গেয়ে একদিন চারিদিক জয় করেছিলেন। আমাদের বার-বার করে বলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, আর গান এখন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমরা যেন হুট করে গান গাইবার অনুরোধ না জানাই। মহিলারা মাথা নীচু করে সীবনব্যস্ত, বড়ো বাড়ি এবং কোথাও কোনো অতিরিক্ত কথা নেই। পথপ্রদর্শক তাঁর ঘরে তাঁর সামনে আমাদের নিয়ে দাঁড় করালেন। সেই অশীতিপর যোষিৎ দ্বিধার সঙ্গে প্রণাম গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখোমুখি বসে আমি সব নিষেধ ভুলে গিয়ে বলে ফেললাম—দিদি, অনেক দূর থেকে বড়ো আশা করে এসেছি। একটা গান শুনব।—তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো পথপ্রদর্শককে বললেন—হারমোনিয়াম নামাও।—হারমোনিয়াম নামানোর কাজ চলছে, ইতিমধ্যে কী গান শুনতে চাই সেই মনোবাসনার কথা তুললাম ধীরে-ধীরে। তিনি সেদিন আমার অনুরোধের গানই শুনিয়েছিলেন। গান শেষ করে তাঁর শেষ কথা ছিল—মৃত্যু পর্যন্ত গান করে যাব।—আমাদের সেদিন ঘিরে রেখেছিল তাঁর অচ্যুত গলা। পথে নেমে অপর্ণাকে প্রশ্ন করেছিলাম—একটা জিনিস লক্ষ করেছ?

—কী?

—হারমোনিয়াম বরাবর আস্তে বেজেছে। গলাকে ছাপিয়ে ওঠে নি। আরও আছে।

—আর কী?

—তিনি স্মৃতি থেকে গান গাইলেন। সামনে কোনো বই বা খাতা খুলে রাখেন নি।

কিন্তু এবারের সমুদ্র কাছের সমুদ্র। সন্ধেরাতে ট্রেনে উঠলে পরের দিন সকালবেলায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর অপর্ণার মামা যেখানে-যেখানে যাবেন বলে শুনেছি সেসব জায়গায় যত ভিড় তত শব্দ। মামার তালিকায় যেসব জায়গার নাম নেই তেমনি দু-একটা নামের কথা বারবার অপর্ণাকে জানিয়েছি। বারবার বলেছি, মামা না গেলেও তুমি অন্তত জয়কে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো। অভিজ্ঞতা হবে। কি-ভাবে যেতে হয়, রিকশাচালককে কী বলতে হয়, সে-সবও বলে দিয়েছি। রিকশা কিন্তু লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত সব সময় যাবে না। এমন জায়গার কথা বলেছি যেখানে রিকশা থামিয়ে ক্রমে-ক্রমে উঠে যেতে হবে। ঝাউ আর ঝাউ চতুর্দিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া দিলে মনে হয় সমুদ্র খুব কাছে। উঠে যাবার পর নীচের দিকে তাকালে তরুবিস্তৃত সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রঙ মনে আসবে না। কেউ-কেউ ওই সময় তৃষিত হয়ে পড়ে। অন্তত আমি তো হয়েছি। মনে হয় মুখের সামনে জলপাত্র ধরলে মহিমার একটা বড়ো প্রকাশ ঘটে যাবে। আর আশ্চর্য এই, তখনই তো উঠে এসে কাছে দাঁড়াবে এক স্থানীয় বিধবা। হাতে জল নিয়ে সে প্রশ্ন করবে জলের প্রয়োজন আছে কিনা। আমি জানি অপর্ণা মামার সঙ্গে মিলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওসব জায়গায় গিয়ে উঠতে পারবে না। তবু ট্রেন ছাড়ার আগেও জয়কে কোলে নিয়ে ওকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে মিটিয়েছি।

পিসিমার এই ঘরে চলে এসে অপর্ণা দু-তিন মাস রাতের শেষে এবং দিনের শেষে নিয়ম করে গলা সাধত। আমি আশান্বিত হতাম। মানুষকে স্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখলে আশা হয়। ধীরে-ধীরে তার হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসার সময়টা পালটে যেতে থাকে। দুপুরের স্নান সেরে খেতে যাবার আগে এবং সন্ধের বেশ কিছু পরে যখন রাতের মধ্যে এসে গেছে যথেষ্ট লিপ্তি, অপর্ণা বসত। একদিন না বলে পারলাম না—অপু, সবকিছু করার একটা করে সময় আছে। তুমি কিন্তু অসময়ে বসছ।

—কিছু করার নেই, সময়ে বসতে আমার লজ্জা করে। ভোরে উঠে চিৎকার না করে বাড়ির কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখাই তো ভালো।

ধীরে ধীরে অসময়ের এই বসার পরিবর্তে শুরু হয়ে যায় এক নতুন ধরনের বসা। পাড়ার শেষ দিক থেকে মার বন্ধু এলে মা ডাকতেন—অপু শোনো, তৃপ্তিদি এসেছেন। হারমোনিয়ামটা নামাও। উনি কিন্তু গান খুব ভালোবাসেন।—কিংবা বুবুনের সূত্রে কেউ এসে বলে বসল—বউদি বসুশ্রীতে কী যেন বইটা চলছে, তাতে একটা রবীন্দ্রসংগীত আছে। বুবুন বলছিল গানটা আপনি জানেন। একটু শোনান না।—এইসব ক্ষেত্রে অপর্ণা হাত মুছতে-মুছতে হারমোনিয়াম নামিয়ে বসে পড়ত। এখনও বসে পড়ে। এই তো কালও বসেছিল। জয়ের কান্না থামাতে না বসে উপায় ছিল না। জয় খুব কম জিনিসই মুখে তোলে স্বেচ্ছায়। তাকে খাওয়াতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয় অপর্ণা। রূপ-কথার সাহায্য নিয়ে, অভিনব সব প্রলোভনের সাহায্য নিয়ে কোনো কাজ হয় না যখন, তখনই তো অপর্ণাকে বলতে হয়—মাম্পি শোনো, তুমি যদি সব খেয়ে ফেল আমি তোমাকে বড়ো খেলনা নামিয়ে দেব।—এই টোপটি সাধারণত গিলে থাকে জয়। চুপচাপ যা মুখে নেবার নিয়ে নেয়। কিন্তু খেয়ে উঠেই হারমোনিয়াম পাবার জন্য তার অস্থিরতা কান্নার রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে তখন আর কোনো কিছু দিয়ে ভোলানো যায় না। অপর্ণা বাধ্য হয় 'বড়ো খেলনা' নামাতে। একগাল হেসে জয় তখন বলবেই—মা, তুমি গান করো, আমি বাজাচ্ছি। —কিন্তু তানপুরা নামানোর উপলক্ষ বহুদিন হল আসে নি। দেয়ালে টাঙানো তানপুরার আবরণী যতই চিত্রিতগাত্র হোক, ধুলো কাউকে ত্যাগ করে না এবং মাকড়সার কাজ কে বলল থেমে থাকে?

বারান্দার আলো জ্বলে উঠল। স্নানঘরে যেতে গেলে পিসিমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়।—কে ওখানে?

বুবুনের ভারী গলা ভেসে এল—আমি।

সেও কি আজ আমার মতো বিনিদ্র? আমি যখন জল-আলো-বাতাস নিয়ে লেখা কবিতা পড়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি, বুবুন তখন কাছের বস্তি-গুলোতে গভীরভাবে ঢুকে যাচ্ছে রোজ। মাঝে-মাঝে বাড়ি ফিরত না। আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বুবুন ফেরে নি, এ-কথা জেনে মার মুখের দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াতাম। মাঝে-মাঝে পেয়েও যেতাম তাকে। হয়তো কোনো বস্তির ভেতর দিয়ে পথের সন্ধান করছি, দু-চারজন হঠাৎ আমাকে ঘিরে ফেলল।—কী চাই? এখানে ঘুরঘুর করছেন কেন?—তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যেতাম। কঠিন আর রাতজাগা চোখ।

—আমি একজনকে খুঁজছি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি।

—কে সে? কাকে খুঁজছেন?

—মালক ভট্টাচার্য, ডাকনাম বুবুন, শান্তি লেনে থাকে।

নাম শোনার পর আরো সাবধানী এবং আরো ভয়ংকর হয়ে তারা আমাকে আলাদা করে সরিয়ে নিল।—তার সঙ্গে আপনার কী দরকার, তাড়াতাড়ি বলুন।

—ও আমার ছোটো ভাই। কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরে নি। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

যারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল এবার তাদের মধ্যে নেমে এল কোমলতা।

—আচ্ছা, আপনি বুবুনদার দাদা, নালীকদা। কিছু মনে করবেন না, আমরা বুঝতে পারি নি। চলুন আপনার সঙ্গে বুবুনদার দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর এক জায়গায় থামল এবং শিশ দিল। সেই শিশ শুনে গলির ভেতরের কোনো এক গলি থেকে যে বেরিয়ে এল সে এক নিরুদ্বিগ্ন কিশোরী। বলা যায় তারই পরিচালনায় থেকে আরও খানিকটা যাবার পর আমি আমার অনুজের দেখা পেয়েছিলাম।

বুবুনের দিকে ভালো করে যেন এতদিন তাকানো হয় নি। না হলে সেই গুচ্ছ গলির জগতেই প্রথম লক্ষ করতাম না তার চেহারার অসম্ভব অধঃপতন। মুখ-মণ্ডলে কিছুদিন আগে দেখা কমনীয়তা একেবারে নেই। তার জায়গায় বিরাজ করছে একটা গোপন কাঠিন্য।—কী ব্যাপার, দাদা?

—কাল বাড়ি ফিরিস নি, মা খুব চিন্তা করছে।

—মাকে তো বারবার বলেছি, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। ধরে নাও আমি নেই।

—আজ কিন্তু একবার বাড়ি যাস।

—চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না। আর কিছু বলার আছে?

—না। আজ একবার চেষ্টা করিস কিন্তু।

হঠাৎ কাছেই কোথাও শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। বুবুন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে।—দাদা, তুমি এই ছেলেটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও।

সেদিন বুবুন চেষ্টা করেছিল কি না জানি না। তবে তাকে বাড়িতে কখনও দেখা যায় নি। তার বদলে নিথর রাতে দরজা খুলে দেখা গেল পুলিস আর আর পুলিস। সদর দরজা থেকে শুরু করে পিসিমার ঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে।—মালিক কোথায়, বুবুন কোথায়? চুপ করে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বলুন। বাবা কিছু বলার আগেই তিন-চারজন সশস্ত্র অবস্থায় ভেতরে ঢুকে পড়ে ঘরে-ঘরে মশারি তুলে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। একজন মার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে আমার বইয়ের আলমারি খুলে শুধু বই নয়, কবিতার খাতাও দেখে নিল। কিছু না পেয়ে যাবার আগে বাবাকে বলল—একটু বাইরে চলুন। বাবা বাইরে থেকে ঘুরে এসে বিস্মিত হয়েছিলেন। সমস্ত পাড়া সামরিক কর্মীরা ঘিরে নিয়ে বসে আছে, আর পুলিস ঢুকে যাচ্ছে সমস্ত রকম অন্দরে। যে বুবুন কিছুদিন আগেও বাবাকে জড়িয়ে ধরে যুদ্ধের গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত, বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেলে যে প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখত—তুমি ফিরে এসো, তার জন্য এত তোড়জোড়, এত আয়োজন, এত সতর্কতা?

পরের দিন তখনও বিকেল হয় নি। নানা গুঞ্জন শুনেছিলাম বলে তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরে এসেছি। মা জেগে শুয়ে আছেন এবং 'পসিমা এই ঘরে টুকিটাকি কাজে নিমগ্ন। বাবা ট্যাকসি করে এসে নামলেন। বাবাকে নিঃস্ব দেখাচ্ছিল। অসময়ে বাবাকে চলে আসতে দেখে মা দৌড়ে এলেন।

—কী হয়েছে গো?

—একটু আগে অফিসে একটা ফোন পেলাম। কে ফোন করেছে জানতে পারলাম না। কথা হল। আজ ভোরে ছাত্রসঙ্ঘের পাশের বাড়ি থেকে বুবুনকে ধরে নিয়ে গেছে। সেই একই ট্যাকসিতে আমি বাবার সঙ্গে আদালতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ে-ছিলাম। যেতে-যেতে শুনলাম বুবুনকে যখন ধরে তখন ওর সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের ঘিরে ফেলে ধরা হয়। ছ জনের মধ্যে একজনকে এমনভাবে মারা হয় যে শেষ পর্যন্ত জীবিত থেকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তার পক্ষে আর সম্ভব হল না।

বুবুন সাতদিন পুলিশ হাজতে ছিল। এই সাত-দিনের বিভিন্ন মুহূর্তে নিপীড়নের পরিমাণের কথা ভেবে মা আর পিসিমা সাঙ্ঘ ছিলেন। শেষে যখন তাকে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হল সাক্ষাৎকারের প্রথম সুযোগে মা আর পিসিমা আমার সঙ্গে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেদিন সারাদিন ধরে বুবুন আর তার বন্ধুদের জন্য খাবার বানাতে ব্যস্ত। নির্মেঘ বিকেলে আমরা জালের ওপারে বুবুনকে পাই। বুবুন মার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। পিসিমাকে বলে উঠেছিল —ভালো আছ তো? আর আমার কাছে বলতে চেয়েছিল সবাই যেন সাবধানে থাকে। একটা খাঁচার মধ্যে প্রিয়জনকে পেয়ে সবাই অনেক কিছু বলতে চায়। ফলে অন্যান্য চিৎকারে আমাদের গলা ডুবে যাচ্ছিল মুহুর্মুহু। তা ছাড়া সাদা পোশাকে অনেক

সময় গোয়েন্দা বিভাগের লোক আশেপাশে থেকে যায় এমন একটা কথা শুনে এসেছিলাম বলে ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হচ্ছিল। কিন্তু চলে আসার আগে পিসিমা আর সামলাতে পারলেন না।—খুব মেরেছে, না রে? আমি সব জানতে পেরেছি। যারা মেরেছে তাদের ভালো হবে না এই বলে গেলাম।

হাজতে দু মাসের বেশি বুবুনকে থাকতে হয় নি। কিন্তু সে স্নাতক হতে পেরেছিল অনেক পরে, অত্যন্ত ধীরে-ধীরে। যারা তার সঙ্গে বিপ্লবে বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল তাদের একজনকেও আজ আর বসে থাকতে দেখি না। কিন্তু বুবুন বসে থাকে। বাড়ির কিছু কাজকর্ম বাদ দিলে হয় সে জয়ের সঙ্গে বসে থাকে, নয়তো তাকে দেখা যায় বাড়ির সামনের গলিতে খালি গায়ে ছোটো-ছোটো ছেলেদের সঙ্গে। আমি ওকে টাইপটা আবার অভ্যাস করতে বলেছি। কী করবে জানি না। আমাদের বাড়িতে আসতে গেলে বাস থেকে যেখানে নামতে হয় তার কাছেই সারি-সারি মাংস টাঙানো থাকে এবং ক্রেতাও অপেক্ষা করে সারিবদ্ধ হয়ে। এই দোকানের ঠিক গায়ে গাড়ি চালানো শেখানো হয়ে থাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অপর্ণা সেদিন ঠিক কোন্ জায়গার কথা বলছিল। অপর্ণা কোনো সাধারণ কাজে বেরিয়ে গুনগুন করে ফিরে এল।

—একটা সুখবর আছে, শুনবে?

—নিশ্চয়ই।

—কালুর মাংসের দোকান আর গাড়ি চালানো শেখানোর যে অফিসটা আছে ওর ঠিক মাঝখানে একটা নতুন সাইনবোর্ড দেখে ঢুকেছিলাম। ওখানে সামনের মাস থেকে গান শেখাবে। ডিপ্লোমা দেবে। ভাবছি ভরতি হব। এখন কী শেখায় জান?

—কী? নাচ-টাচ হবে বোধ হয়?

—না না, এখন যোগ-ব্যায়াম শেখাচ্ছে। বড়ো-বড়ো লোকের মেয়েরা গাড়ি করে শিখতে আসে।

—আর কিছু শেখায় না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। স্পোক্‌ন্ ইংলিশের ক্লাসও হচ্ছে। বুবুনকে ভাবছি ভরতি হতে বলব। ঠিকমতো কথা বলতে পারলে অনেক জায়গায় চাকরি পাওয়া যায়।

অপর্ণা বুবুনকে কথোপকথনের ক্লাসের কথা বলে রাজি করিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আশা করা যায় সমুদ্রতট থেকে ফিরে অপর্ণা আর বুবুন দুজনেই একটা প্রণালীর মধ্যে চলে যেতে পারবে।

ওরা যখন কেউ গান শিখবে, কেউ বিদেশী ভাষায় কথা বলার চেষ্টা শুরু করে দেবে কী করব আমি তখন? আমিও কি কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব? না না, একেবারেই নয়। তবে কি সেই সময় বাড়ি বসে জয়কে পড়াব? তাকে কোলের কাছে বসিয়ে বলব—মাম্পি, আনটি তোমায় কী করতে দিয়েছে দেখি? তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। অপর্ণাও আমাকে এ-ব্যাপারে বুঝে গেছে। সেও আমার ভরসায় ঠাকুরদা-ঠাকুমার পাশে রেখে যাবে না ছেলেকে। বরং বেরোনোর কিছু আগে দেবরকে বলবে—তুমি একটু শোণির কাছে মাম্পিকে রেখে এসো। ফেরার পথে ওকে নিয়ে আসব। বইগুলো ওর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। শোণিকে বোলো হোম-টাস্কটা করিয়ে দিতে।—অপর্ণা জানে সন্ধের ঠিক পরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। তবে কোথায় যাই, কেন যাই, কার সঙ্গে যাই, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তার আজও ঠিক করে জানা হয়ে ওঠে নি। ঠিক করে জেনে ওঠা এককথায় বলা যায় অসম্ভব। তার প্রধান কারণ কোথাও যাবার ঠিক আগে আমি নিজেও জানি না সত্যি কোথায় যাচ্ছি। [ক্রমশ

হাসান আজিজুল হকের গল্পের জায়গা জমি মানুষ

সুবীর রায়চৌধুরী

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯ খ্রী) প্রধানত যাঁদের কথা লেখেন এবং যাঁদের নিয়ে লিখতে চান, তাঁরা কেউই তাঁর সম্ভাব্য পাঠক নন। এ নিয়ে তাঁর ক্ষোভ আছে:

> এদের কেউই মানুষের জীবন কাটালো না। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদি কথা তোলা তো ইয়ার্কি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না—পশুর সঙ্গে মানুষের জীবনের যদি কোথাও কোন ভেদ-রেখা থেকে থাকে, সেটা এদের কাছে একেবারে লেপেমুছে গেছে। উচ্চ, মধ্য, প্রাথমিক সবরকম শিক্ষার দরজাই এদের জন্যে বন্ধ, তা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হোক আর মাগনাই হোক। মানুষের জন্ম হলেই বাঁচার একটা যন্ত্র সে বিনা পয়সায় পেয়ে যায়—এই হিসেবেই এরা বেঁচে থাকে। তবে কতোদিন যন্ত্রটা চলবে তা কেউ জানে না। বিকল হলে প্রকৃতি দয়া করে দিন-কতকের জন্য মেরামত করে দিলো তো চললো —না হলে গেল বন্ধ হয়ে। চিকিৎসার ব্যাপার হচ্ছে এই।
>
> ("গল্পের জায়গা জমি মানুষ", 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি', ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ১০২-৩)।

এই হ'লো 'পাতালে হাসপাতালে'র (১৯৮১ খ্রী) লেখকের প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর গল্পের মানুষেরা সেই 'নামহীন গোত্রহীন'রা (১৩৮২ বঙ্গাব্দ) শুধু উপকরণ হিসেবেই থাকবে—সাহিত্যের অঙ্গনে পাঠকরূপে তাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। অন্যদিকে যাঁরা তাঁর গল্পের অনিবার্য পাঠক, সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য তাঁর রয়েছে অবিশ্বাস এবং অনুকম্পা। তিনি নিজেই এই শ্রেণীভুক্ত ব'লে জানেন যে এঁরা সমাজসচেতন হন আর নাই হন, তাতে আখেরে ব্যক্তি বা সংকীর্ণ গোষ্ঠীর আত্মোন্নতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। বস্তুত হাসান আজিজুল হকের মধ্যে একটা জীবনানন্দী মেজাজ আছে। তিনি নিজের প্রতি, স্ব-শ্রেণীর প্রতি নির্বিকারভাবে নির্মম হ'তে পারেন।

প্রায়ই দেখা যায় তাঁর গল্পের বিবেকবান চরিত্রেরা অসুস্থ। স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষমতা তাঁদের নেই। সেজন্য তাঁর কিছু কিছু প্রেমের গল্প শুধু বিষণ্ণ নয়, ভয়ঙ্কর শূন্যতাবোধে আচ্ছন্ন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য' (১৯৬৪ খ্রী)-র অন্তর্ভুক্ত "উত্তর বসন্তে" গল্পটিই ধরা যাক। বাণী জানে তার প্রেমে পড়তে নেই, কেননা তার পরিবারের সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ। পাগলদের ভালোবাসার অধিকার নেই। অথচ প্রেমের কি কোনো বিকল্প আছে? কয়েক বছর আগে বাণী যখন কিশোরী ছিলো, তখন তার দিদি লিপি ভালোবেসেছিল কবীর নামে এক তরুণকে। বাণীও তাকে পছন্দ করতো এবং

> বাড়ি এসে এক বিছানায় শুয়ে বাণীর গলা জড়িয়ে লিপি একটানা কথা বলে যেত, কবীরকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। এবারই তো সে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করবে। তারপর আর দু-বছর মাত্র।
>
> তুই ওকে বিয়ে করবি?
>
> নিশ্চয়, বিয়ে করব না তো এমনি? আমাকে সাহায্য করবি না তুই?
>
> হ্যাঁ, করব না কেন?
>
> বাণীর গলা জড়িয়ে কথা বলতে বলতে লিপি ঘুমিয়ে পড়ত।

["উত্তর বসন্তে", 'সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য', তৃতীয় সং ১৯৮৬, পৃ ৪৮—৪৯]

তারপর পৃথিবীতে অসংখ্য ছোটো ঘটনার মতো লিপি একদিন মারা যায়। হয় দেশবিভাগ। বাণীরা পূর্ব পাকিস্তানে চ'লে আসে। কবীরের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। যবনিকা উত্তোলিত হয় কিছুদিন পরে যখন পঁচিশ বছরের বাণী নতুন ক'রে বাঁচবার চেষ্টা করছে অসুস্থ পরিবারটিকে উদ্ধার করবার জন্য। আবার কলেজে ভর্তি হয় এবং সেখানেই নতুন অধ্যাপকরূপে কবীরের পুনরাগমন। তাকে দেখে বাণীর উপলব্ধি: 'যখন ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণ করলেই আমার বুকটা ধ্বক করে ওঠে, তখন ইতিহাসের নতুন অধ্যাপক কবীর সাহেব আমাকে সেই লাল রোদের কথা মনে করিয়ে দিল। আশ্চর্য' (ঐ পৃ ৫০)

বিনিময়ে পাওয়া বাণীদের পাকিস্তানের বাড়িটা প্রশস্ত, 'কিন্তু অতবড় বাড়িটা অন্ধকার। আর বাপ-মায়ের কাছে জীবনটা ন্যাকড়ার মত বাতাসে উড়ছে' (পৃ ৪৯)। অধিকাংশ ঘরই বন্ধ থাকে, কেননা মানুষ এখানে অবাঞ্ছিত। স্মৃতিকে রুদ্ধ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কবীরের সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রেম সবার জন্য নয়:

> বাণী বলল, এখন তোমাকে যেতে হবে কবীর। এ-বাড়ির সবকটি মানুষ অসুস্থ।
>
> বাণীর ঘরে এসে বিস্বাদ কটু চা-টা কোনরকমে খেয়ে কবীর বলল, আমি আজ আসি।
>
> চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসব।
>
> ওরা চলতে চলতে যখন রাস্তার পাশে বড় বট-গাছটার নিচে এসেছে, কবীর ডাকল, বাণী।
>
> সে ডাকটা শুনে প্রথমে ভীষণ চমকে উঠল বাণী, তারপর শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ। আর কবীর আস্তে আস্তে টেনে নিল ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে। ফিসফিস করে বলবার চেষ্টা করল, তুমি আমাকে কোনদিন বুঝতে পারলে না বাণী, কোনদিন চেষ্টা করলে না।
>
> ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বাণী, না আমাকে লোভী করে তুলো না। আমরা সবাই অসুস্থ। আমাদের লোভী করতে নেই। আমাদের কোন অধিকার নেই জীবনে। (পৃ ৫১-৫২)।

শঙ্খ ঘোষের মতো আমাদেরও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে:

> 'বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন ভারি
> সকালও যার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি?
> (সূর্যমুখী)

হাসান আজিজুল হকের গল্পের জায়গা জমি প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার তিনি উদ্বাস্তু লেখক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তিনি, পরে পূর্ব পাকিস্তানে চ'লে যান। এ-বঙ্গ ও-বঙ্গের অনেক সাহিত্যিকের মতোই দেশ-মাটি ছেড়ে যাবার অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুক্ষণ হানা দেয়। তাঁর গল্পের শরণার্থীরা ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্যাটি শুধু সাম্প্রদায়িক নয়। কেননা দেশ-ত্যাগের অভিজ্ঞতা হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সমান। বস্তুত হাসান আজিজুল হক বাঙলা ভাষার লেখক-বৃন্দের মধ্যে বিরল দু-একজনের অন্যতম যাঁরা হিন্দু উদ্বাস্তু মুসলমান উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিষয়ে সমান আগ্রহে, সমান সহানুভূতিতে লিখেছেন। জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান জীবনকে নিবিড়ভাবে জানেন, আর পরিবেশের প্রভাবে হিন্দু জীবনযাত্রা এবং হিন্দু সমাজের গড়নের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। অবশ্য শুধু পরিবেশের প্রভাবে বললে একটু কম বলা হয়, হাসান আজিজুল আপাতভাবে যতোই নৈরাশ্য-বাদী হন না কেন, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষ বিষয়েই তাঁর মমতা এবং আগ্রহ লক্ষ করি। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখি রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তির অসহায়ত্ব। যে অনুভূতিশীল, সে নিঃসঙ্গ, আর তার বিপরীত প্রান্তে রয়েছে বিবেকহীন আত্মতৃপ্ত মানুষ। "থাঁচা" (পূর্বে "আততায়ী আঁধার" নামে প্রকাশিত) গল্পটি এক হিসেবে হাসান অজিজুল হকের অণুবিশ্ব। এটি শুধু একজন শিল্পীর ব্যর্থ জীবনের কাহিনী নয়, অথবা একজন সংখ্যালঘুর দেশত্যাগের ব্যর্থ ব্যাকুল প্রয়াসও নয় কিংবা একটি গরিব পরিবারের ভেঙে টুকরো হ'য়ে যাবার কাহিনীও নয়। ব্যর্থতা অভিশাপ, ব্যর্থতা অপমান এবং এই ব্যর্থতার দরুন অপরাধবোধ শিল্পী অসুজাক্ষকে তাড়িত করে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অসুজাক্ষ সেতার বাজায়। যদিও সংসারের অভাব মেটানোর জন্য তাকে সেতার ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরতে হয়। তাতে যে খুব একটা সচ্ছলতা আসে না তা বলাই বাহুল্য। তবুও কে না স্বপ্ন দেখতে চায় নতুন দিনের? অসুজাক্ষ ভাবে দিন বদলাবে দেশত্যাগ করতে পারলে। সেই স্বপ্ন সে সঞ্চারিত করতে চায় স্ত্রী সরোজিনীর মধ্যে। কীরকম জায়গায় সম্পত্তি বিনিময় হবে তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা চলে। যেমন

> ওদিকটায় পাহাড় আছে, তাই না? দুহাতে মাটির উপর ভর করে সরোজিনী অসুজাক্ষের দিকে ঝুঁকে আসে, পাহাড় আছে বলছিলে না তুমি? রুগ্ন খুকির মতো বড়ো বড়ো চোখে সে চেয়ে থাকে, পাহাড় না থাকলে ওদিকে যাবো না বাপু—আমার বাবা বলতেন—
>
> ওদিকে পাহাড় কোথায় গো? অসুজাক্ষ খেতে খেতে বলে, নলহাটি থেকে তুমি পাহাড় দেখতে পাবে—ছোটনাগপুরের পাহাড়—ঠিক যেন নীল মেঘ, ভারি সুন্দর।
>
> সেখানে যেতে পারব না? সরোজিনী ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার করে।
>
> আহা সে তো অনেক দূর—বিশ ত্রিশ মাইল হবে। ওটা তো সাঁওতালদের জেলা।
>
> তাহলে ওখানে বিনিময় বন্ধ করে দাও তুমি। কত কষ্টে দেশ ছাড়ছি। ইণ্ডিয়ায় গেলে বার বার কি বদলাতে পারব? বিনিময় যখন হবে একটা ভাল জায়গায় যাওয়া ভালো না?

*

যেতে যখন হবেই—তখন তাড়াতাড়ি কি ভালো নয়? যত তাড়াতাড়ি মায়া কাটানো যায়। সবাই চলে যাচ্ছে। আমরাও তো যাব।

আমরাও যাব—আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এইসব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। একটা সজল আকাশ, একটি ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুরঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেষ, পদ্মপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে। সেই নীল পর্বত-শ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে। আমরাও যাবো। অসুজাক্ষ খুব তাড়াতাড়ি খেতে থাকে, আচ্ছা,

আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেমন ধরো নদী আছে, গাছপালা একটু বেশী—কোন ঠাণ্ডা জায়গায়? অম্বুজাক্ষ প্রশ্ন করে। অর্থাৎ একই পাখি দেখব—একই মেঘ আর আকাশ—এই রকম কথা বলে ফেলে সে।

কোথায় যাবে?

নবদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও। শুধু নবদ্বীপ কেন—ও দেশটাই কতকটা আমাদের দেশের মতো। আমি গেছি তো—বেশ গাছপালা আর সব ছায়া ছায়া।

না বাপু জঙ্গুলে জায়গায় গিয়ে কাজ নেই। কোনো শুকনো জায়গায় চলো।

["খাঁচা", 'জীবন ঘষে আগুন', দ্বিতীয় সং, ১৯৮৫, পৃ ৩৯-৪০]

এরকম শুকনো আলোচনাতেই তিন বছর কেটে যায় এবং আমরা জানি সারাজীবন যাবে। ইতিমধ্যে অযত্নে অবহেলায় অম্বুজাক্ষর বাস্তুভিটেয় আগাছা জন্মায়, সাপের আস্তানা হয়। আর ছেলেপিলেগুলি হয়ে ওঠে অবাধ্য, উদ্ধত, আশাহীন। সাপ আছে জেনেও সরোজিনীর ছেলে অরুণ উঠোনের জঙ্গলে বেপরোয়াভাবে যায়। মায়ের অনুরোধ-উপরোধ গ্রাহ্যও করে না। অরুণকে শেষ পর্যন্ত সাপেই কাটে। মায়ের উৎকণ্ঠার জবাবে সে বলে,

চুপ করো, কামড়িয়েছে তো কি হয়েছে? কেঁউ কেঁউ করছো কেন?

তুই কি করলিরে বাপ—সরোজিনী বুক চাপড়ে চুল টেনে একটা কাণ্ড করে।

মরে যাবো এই তো? বয়ে গেছে বাঁচতে। এই ছ্যাক্ কলা দেখিয়ে চলে যাবো। অরুণ বিরাট অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো আঙুল নাড়াতে থাকে।

কি জানি শালা কি ব্যাপার—বলতে বলতে অরুণ নিদ্রার মধ্যে চলে গেল। ভোরের দিকে সে প্রস্থান করল চিরদিনের মতো। (ঐ, পৃ ৪৩)।

পুত্রশোক ভোলাবার জন্যই সম্ভবত অম্বুজাক্ষ আবার দেশত্যাগের প্রসঙ্গটি তোলে :

জানো সরোজিনী, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?

কিসের সব ব্যবস্থা?

বিনিময়ের—বলেই একটু বিব্রত হাসি হাসল অম্বুজাক্ষ।

অনেকদিন থেকেই তো শুনছি—সরোজিনীর হাতে একটা হাতা, রান্না করছিল। রোগা মুখের ওপর চকচক করছিল চোখদুটো। একটু মেঘের মতো এসে সেটাকে ঢেকে দিয়ে গেল।

না এবার আর কোন কথা নেই। আমাদের জমিসম্পত্তি সব দেখে গেছে। পছন্দ হয়েছে? উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে আস্তে আস্তে জিগগেস করলো সরোজিনী। (ঐ, পৃ ৪৩-৪৪)

গল্পটি নতুন বাঁক নেয় যখন কাল্পনিক অথবা সত্যি-কারের বিনিময়কারীর সঙ্গে অম্বুজাক্ষর নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়।

পছন্দ হবে না মানে—এমন বাড়ি, এমন গাছ-পালা কোথায় পাবে। শুধু বলল, বড্ডো জঙ্গল—পুকুরটার সংস্কার দরকার। আর বলল বাড়ি-টাকে তো শেষ করেছেন। অশথ আর বটগুলোকে উৎখাত না করতে পারলে বাস করাই যাবে না। বাড়ি থাকবে না দুবছরের বেশী। বললাম, আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কি আর আছি এখানে? এবাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিগগেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিগগেস করলাম উল্টো।

কি বললেন?

এই আর কি! ভবিষ্যৎ নেই—নিরাপত্তা নেই। যেমন আমরা বলি আর কি!

এখানে আসলে রাজা হয়ে যাবে ভাবছে না?

তাইতো মনে হোল। সব নাকি নতুন করে বানাবে।

আমিও তাই বলি—আমরাও সেখানে গিয়ে সব নতুন করে বানাব। এমন হয়েছে আজকাল যে চুল নখ বড়ো হলে মনে হয় একেবারে সেখানে গিয়ে কাটাবো।...(ঐ পৃ ৪৪)

সব শরণার্থী প্রসঙ্গে একই কথা বলা চলে, কেন যাচ্ছেন? কিন্তু কোনো মানুষ কি স্বেচ্ছায় ছিন্নমূল হ'তে চায়? সেই প্রশ্নের উত্তর আছে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'-এর অন্তর্ভূত "পরবাসী" গল্পে। এটি একই সঙ্গে দাঙ্গা এবং দেশত্যাগের গল্প।

কোনো এক শীতের সকালে বশিরের দিন শুরু হ'লো। আর পাঁচটা দিনের মতোই কর্মব্যস্ত এবং বিশেষত্বহীন। ভেরেন্ডাগড়ের জনৈক বিশ্বেকডার মাঠে যাচ্ছে ধান কাটতে। পথে ভক্তর সঙ্গে দেখা হ'লো। আর ওয়াজদ্দি তো সঙ্গেই ছিলো। আকাশে বাতাসে কোনো উত্তেজনা নেই। তারপর মাঠ থেকে ফেরার পথে বশির ওয়াজদ্দিকে একটা গুজবের কথা বলে, 'পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন্ একছার কাটচে—কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের।' সঙ্গে সঙ্গে নিজের আশঙ্কার কথাও গোপন করে না, 'হাজার হলেও পাকিস্তানটা মোচলমানদের ছ্যাশ, সিখানে মোচলমানদের রাজত্বি—।' বিরক্ত হ'য়ে ওয়াজদ্দি বলে;

তাইলে পাকিস্তানে যান নাই ক্যানে?

আমাদের কি সায়োস হয় চাচা ঘর সংসার লিয়ে কোথাও যেতে। তেবু ছ্যাশটো—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ওয়াজদ্দি, বশিরের মুখের ওপর তীব্র চাহনি ফেলে নিঃশব্দে ওকে যেন দগ্ধ করতে থাকে সে। বশির দাঁড়িয়ে পড়ে বোবার মত, তেমনি করেই চেয়ে থাকতে থাকতে ওয়াজদ্দি জিগগেস করে, তোর বাপ কটো? এ্যাঁ—কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? ছ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি? যা—বলেই ওয়াজদ্দি নিজেই চ'লে গেল হন হন করে। (পৃ ২৬)

বশির কতটা বুঝেছিল জানি না, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই ওরা এলো। পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল ওয়াজদ্দির ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন এবং তার বিশ্বাস আর স্বপ্ন। বশির চোখের সামনে দেখলো ওয়াজদ্দির রক্ত। বশির তখন সবাইকে ছেড়ে নিজের দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে—আল্লার ওপরেও আর আস্থা নেই তার :

ঝোপে ঝাড়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাদিন, কোন মানুষের সামনে যায়নি, সাহায্য চায়নি কারো কাছে, প্রার্থনা করেনি। ঈশ্বরের কাছেও না। মনে মনে সে বলেছে, আমি আর বশির নাই—বশির খ্যাম, বশিরের হয়ে গেলচে—ছ্যাশ ফ্যাশ নাই—আমি এ্যাকোন আর এক ছ্যাশে জন্ম লোব। (পৃ ২৭)

এমনি ক'রে সে উপস্থিত হ'লো দেশের সীমানায়। সেটা কোন্ দেশ এবং তার দেশ কিনা সে জানে না—'সে দেখছিল বিরাট চ্যাপটা একটা দেশ। সেই বিরাট দেশটা সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে যেন ছোট্ট হয়ে ফুলছিল তার চোখে;' হঠাৎ সে দেখতে পেলো একটি নির্বাক মানুষকে যার 'পরনে মোটা ধুতি, গায়ে চাদর, কাঁধে বাঁক।' আর সঙ্গে সঙ্গে বশিরের

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, চিৎকার করে কে ডাকল, বচির বচির, তার মুখে ঝলকে পড়ল বল্লমগাঁথা সন্তানের উষ্ণ রক্ত। মৃত মাছের চোখের মত ওয়াজদ্দির শাদা চোখ অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তীব্র চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করল।

*

পালাইছিলে শালো ই ছ্যাশ থেকে, শালো! চাঁদের মৃদু আঘাতেও গরিলার মত বিরাট দু-পাটি শাদা দাঁত ঝকঝক করে ওঠে।

এই প্রতিশোধ নেবার পরেই বশির দেখল 'সেই মুখ ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ—রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনিই অবাক। চোখের ওপর থেকে ধোঁয়াটে পরদাটা যেন

সরে গেল, আর তার চোখের পানিতে ধূসর হয়ে এলো দুটি পৃথিবী—যাকে সে ছেড়ে এলো এবং যেখানে সে যাচ্ছে।' (পৃ ২৯)

এককথায় বশিরের নবজন্ম হ'লো। কিন্তু এরপরে তার কি বাঁচা সহজ হবে? মানুষের এবং মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক অপচয় হাসান আজিজুল হক শান্তভাবে বর্ণনা ক'রে যান। তিনি ইচ্ছে ক'রেই রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শনের কথা তোলেন না, যদিও তিনি রাজনীতিনিরপেক্ষ নন। শোষক-শোষিতের সম্পর্কে তাঁর হৃদয় এবং মস্তিষ্ক ঠিক জায়গাতেই অবস্থিত। তাই ব'লে সর্বহারা মাত্রেই প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী—এরকম সরলীকরণে তাঁর আস্থা নেই। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় আরো জানেন যে সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেক নিরক্ষর আছে, তাই ব'লে তারা অশিক্ষিত নয়। তাছাড়া তাদের সংগ্রামী জীবনে এক ধরনের অকপটতা আছে যাতে তারা আসল রাজাকে না চিনলেও নকল রাজাকে ধ'রে ফেলে। 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পগুলির পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই বিরাট সংগ্রামে বহু বরণীয় ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন, ইতিহাস যাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে। এর বাইরেও অনেকে এতে যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটাই একটা বোঝা। তবু তাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন হবে। শুধু এইটুকু প্রত্যাশা। "কৃষ্ণপক্ষের দিন"-এর রহমান তো স্পষ্টই বলে :

'—আমি মানি না যে বাঁচা লাগবই, থু মারি মোর জীবনে'—(পৃ ৪৫)

আর জামিল ঘোষণা করে,

কাউকে এদেশের বুকের উপর বসিয়ে দেবার জন্যে আমরা লড়ছি না। আমরা মালিক বদলাতে চাই না। প্রথমে ধরো এই বীভৎস গণহত্যা আর লুঠতরাজ। আমরা এই শুয়োরের বাচ্চাদের দেখাবো—ওদের দাঁত ভেঙে দেব। তারপর এই দেশ এই দেশের সমস্ত মানুষের হাতে যাবে। বুঝতে পারছো? (ঐ, পৃ ৫২)।

এই 'মানুষ' শাসকের সন্ধান কতটা সফল হয়েছে তার বিবরণ আছে 'পাতালে হাসপাতালে' (১৯৮১ খ্রী) গল্পগ্রন্থে। নামগল্পটি পশ্চিমবঙ্গের একটি পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 'খনন'-ও এখানে পুনরমুদ্রিত হয়েছে। সুতরাং এই দুটি গল্প এখানকার পাঠকের অপরিচিত নয়। যাই হোক, এখানেও দেখি হাসান আজিজুল হক প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক গল্প লেখেন না। তিনি কখনো কখনো তাঁর গল্পে পশুপ্রাণীদের আনেন রূপক তাৎপর্য দেবার জন্য। তাঁর প্রথম গল্প "শকুন" (১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল'-এ প্রকাশিত), "জীবন ঘষে আগুন" (১৯৭৩ খ্রী) গ্রন্থের একই নামের গল্পটি এবং "শোণিত সেতু" এই পর্যায়ে পড়ে। "শকুন"-এর পর হাসান আজিজুল হক অনেক দূরে স'রে এসেছেন, তবুও এখানে তাঁর কণ্ঠস্বর চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথ অপাপবিদ্ধ সরল কিশোরদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন, যেমন "ছুটি"। দুঃখের বিষয় সেই সহজ সুন্দর কৈশোর বহু-দিন আগে হারিয়ে গেছে। "শকুন" গল্পেরও প্রধান চরিত্র অন্বেষয়েসি ছেলেরা—'দলের মধ্যে গরুচরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ দরকার হলে গরু চরায়, ঘাস কাটে, বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে।' তাদের খেলাও অভিনব। তারা সমবেত হয়েছে একটি আহত শকুনের মৃত্যু দেখবার জন্য। তাদের ভাষা শব্দব্যবহার, কৌতূহলের বিষয় ফটিক-তারাপদদের অভিজ্ঞতার বাইরে। যেমন

জামু বলল, উদিকে যাস না—চ ঘুরে যাই।
তোর বাড়ি তো উদিকেই—চ দেখি না উ দুটো কি।
বাড়ি কাচে বলেই জানি উ শালা শালী ক্যা?
ক্যা র‍্যা?
দরকার কি তোর শুনে?
বল্ ক্যানে!

উ হচে জমিরদ্দি আর কাদু শ্যাখের র‍াঁড় বুন।
কি করচে উখানে?
আমড়ার আঁটি। চ বাড়ি যাই। (পৃ ১৭)।

লেখক স্পষ্টাস্পষ্টি বলেন না যে এটা শকুনে সমাজ। তিনি শকুনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরেকটি অবাঞ্ছিত মানবশিশুর মৃত্যুর বর্ণনা দেন। একটু আগেই বলেছি যে-শিশুরা মুমূর্ষু শকুনকে দেখছিল তারা কেউই রবীন্দ্রনাথের কিশোর চরিত্রগুলির মতো নিষ্পাপ নয়। আসলে তফাতও খুব একটা নেই। কেননা এরাই আবার 'যখন গভীর অন্ধকার নেমে আসে তখন ছেলেরা ছেঁড়া মাদুরে, সোঁদা মাটিতে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়—অসুবিধের মধ্যে, অশান্তির মধ্যে না খেয়ে খালি পেটে ছেলেগুলো বেঘোরে ঘুমোয় (পৃ ১৭)।' তখনও পর্যন্ত তাদের ঘুম ভাঙেনি, শকুনটা মাঠে ম'রে প'ড়ে আছে। আর

দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধোস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মত।
আশপাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে নিয়ে আসছে মৃত শিশুটি। (পৃ ১৭)

দুটি মৃত্যুর প্রতিতুলনা আকস্মিকভাবে আসে ব'লেই তার আঘাত আমাদের কাছে এতো তীব্র।

শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য সেক্স্ বা যৌনতাকে বহু লেখকই ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার দম্ভ, তারুণ্যের অহঙ্কার, পুরুষের অধিকারবোধ চিত্রণে এটি প্রচলিত রীতি। কিন্তু এই সেক্স্-ই হ'য়ে ওঠে নির্যাতিতা অভুক্তাদের সমবেত প্রতিবাদের ভাষা "সরল হিংসা" গল্পে। অবশ্য শুরু হয়েছিল সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ফুটপাথেই বামনের দেখা হয় মেয়েটির সঙ্গে। তার কোনো নাম দেননি লেখক—বোধহয় রাস্তাঘাটে এরকম মেয়ে হামেশাই দেখা যায় ব'লে তার বিষয়ে শুধু বলা হয়েছে,

সাপের মতোই, কামড়ানোর পর মাথা হেলিয়ে সাপ যেমন বিষ ঢালে, তেমনি করেই ঘাড় কাৎ করে বুকের দুধ ঢালে সে একমনে। পাশেই শাদা দুধ তার তলপেট বেয়ে নিচের দিকে যায়—কিছু উপচে পড়ে রাস্তা ডুবিয়ে দেয়। আজ সাত-দিন হয় তার শেষ বাচ্চা নিঃশব্দে মরে গেছে। এই রকম ক্ষতি তার আজই ঘুবার ঘটেছে।
সারাদিনে হামি একবার খেনু—দুধ হয়ে বেরিয়ে গেনু তবে তো হামি আর বাঁচিম না—বসে বসে মেয়েটি আকাশ পাতাল ভাবে। তিনটি ডাস্টবিন খোঁজা হয়ে গেছে তার খানিক আগে নেমেছিলো এক ড্রেনে, কিছুই মেলেনি। (পৃ ১৯)

কিন্তু মেয়েটিকে তাই ব'লে নিঃস্ব মনে করার কারণ নেই। তার শরীরে পুঁজিপাটা কিছু আছে আর 'যেমনই হোক, সে জেনেছে সংসার কেমন আর কাকেই বা বলে পুরুষমানুষ।' এরকম মেয়েকে বামনের পছন্দ হয়। আগে টাকাটা দিতে হবে এই শর্তে তারা বিহারের জন্য আড়াল খোঁজে। আর তখনই শুরু হয় অতর্কিতে আক্রমণ। আগাছা জঙ্গল থেকে একে একে বেরিয়ে আসে গোলাপি, টেঁপি, জয়তুন, তসিরুন—'স্বচ্ছন্দ নির্বিকার ন্যাংটো মেয়েদের' দঙ্গলে বামনের তখন নাভিশ্বাস উঠছে। সবার মুখে প্রায় একই কথা, 'এই যে সায়েব, আমাকে ছাখেন, ঐ পেত্নীর চেয়ে আমি অনেক সোন্দর, আমারে মাত্তর এট্টা টাকা দিবেন। ছাখেন, আমি ছাখাই, ছাখেন—।' ক্ষুধা আর যৌন ক্ষুধার বীভৎস প্রতিযোগিতায় বামন দিশেহারা। কিন্তু বাঘিনীরা মরিয়া :

ওদিকে বামন মানুষটিকে হাতে হাতে লোফালুফি করে জয়তুন, টেঁপি, তসিরুন আর গোলাপির দল। পুষ্প তার ঘাড়ের কাছে নখ ডুবিয়ে ধরে, কথা নেই মুখে তর, মুখ কুঠ নাকি, ও বাবু? প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় সে, ছিটকে পড়ে বামন। প্রায় সাথে সাথেই তসিরুন গুঁজে ধরে তার ঘাড়, নষ্ট

করার মতো একটি মুহূর্তও তার হাতে নেই। কোন কথা সে বলে না, তার পিঠের উপর চেপে বসে প্রাণপণে হাত চালিয়ে যায়। শেষে তসিরুনকে টেনে সরিয়ে জয়তুন বলে, মিনসে কি তোরে একা পছন্দ করিছে—সরে আয় বলছি। সবাই মিলে চিৎ করে শুইয়ে দেয় লোকটাকে। বামন সব চেষ্টা ছেড়ে দেয়, দুহাত ছড়িয়ে দেয় দুদিকে, মেলে দেয় দুই পা যতদূর যায়, একটা গোল আলো ঠিক তার মুখের উপরে এসে পড়ে, শাদা চোখ দুটিতে তার কি এক ভয়ঙ্কর কষ্ট। ঘৃণার বা ভালোবাসার এক ফোঁটা লাল রক্তও আছে চোখের কোণে। (পৃ ২৬)

ভিখিরি মেয়েরা মাঝে মাঝেই বাবুদের মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে, যেমন দেখি "খনন" গল্পে শাহেদের বেলায়। একদা সুজলা সুফলা দেশে আজ ভাত ভাড়িপাল্লায় বিক্রি হয়, একটি শিশু একমুঠো ভাত চুরি করলে দোকানদারের লাথি খায়। সেই শোক ভোলবার জন্যই তো শাহেদের চাই স্বচ্ছ হুইস্কি আর মেয়েমানুষ। ইতিমধ্যে

মুনীর চোখ তুলে দেখলো দরজার কাছে সেই যুবতী মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তার সঙ্গে বাচ্চাটি নেই। দরজার চৌকাঠে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বুক দুটি আগের মতোই খোলা। মেয়েটির মুখে সামান্য একটু হাসি আছে। হাসিটাও তার চেহারার মতো পরিষ্কার।

জখম জানোয়ারের মতো পুরো বাড়িটা কাঁপিয়ে শাহেদ চেঁচাতে লাগলো, তাড়িয়ে দে, ওকে তাড়িয়ে দে, দোহাই তোর, তাড়া ওকে। (পৃ৮৬)

এরকম একটি ভিখিরি মেয়ের কথা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ 'লজ্জা' কবিতায়

বাবুদের	লজ্জা হলো।
আমি যে	কুড়িয়ে খাব
সেটা ঠিক	সইল না আর
আজ তাই	ধর্মাবতার
আমি এই	জেলা হাজতে
দেখে নিই	শাঠ্যে শঠে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো আমার প্রবন্ধের শিরোনামের কথা। জায়গা-জমির বদলের সঙ্গে সঙ্গে কি মানুষেরও পরিবর্তন ঘটে। বড়োলোক-গরিব লোকের ব্যবধান, শহর-গ্রামের বিচ্ছেদ, শিক্ষিত-নিরক্ষরের সংযোগ-হীনতা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমান সত্য। 'পাতালে হাসপাতালে'-র পটভূমি অনায়াসেই হ'তে পারে কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ অথবা এদেশে যে কোনো বড়ো শহর। আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক সীমাই সাহিত্যের শেষ কথা নয়। উদ্বাস্তু হাসান আজিজুল হক তা ভালো ক'রেই জানেন। তিনি মানুষের রূপকার।

অনিবার্য

আবুল হাসানাত

এমন লোকের হাতে পড়বে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। অথচ এমন নয় যে তার বাবা-মা তাকে পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছে। তাঁরা পাত্রের খোঁজ নিয়েছেন, তার বাবা-মার খোঁজ নিয়েছেন; আত্মীয়স্বজনের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। পাত্রের দাদা আর নানার খবর নিতেও ভোলেন নি। দেখা গেল, এ বংশে বিত্ত না থাক, শিক্ষাদীক্ষা আছে। গুলশানে বাড়ি না থাক, শেখসাহেব বাজারে একটা দোতলা বাড়ি আছে। পাত্র কলেজ-টীচার। অথচ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রিজিয়া বড়ো বিব্রত বোধ করে।

এই যুগে তাকে বোঝানো যাচ্ছে না যে এখন চাকরি-বাকরি করা দোষণীয় নয়। আশ্চর্যের বিষয় তার শ্বশুর-শাশুড়ি মানা করছেন না। বরং তাঁদের বলতে খুব খুশি হয়ে উঠলেন।

শ্বশুর খোরশেদ আলী বললেন, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, মা। এতে আমাদের আপত্তির কী আছে। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ সংসার কী ভাবে চলছে। এটা তো মা জানা কথা, জিনিসপত্রের যা ঊর্ধ্বগতি তাতে স্রেফ মাইনে দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। অন্যকিছু করতে হবে। অধিকাংশই তো ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে এবং এখন এটা এত বেশি হয়েছে যে মা, এটা যে অন্যায়, এটাও সমাজে আর স্বীকৃত নয়।

রিজিয়া বলল, ও তো বুঝতে চাচ্ছে না, বাবা।

তুমি বুঝিয়ে বলো। ও খুব জেদি। তাই হয়তো তোমাকে একটু সময় দিতে হবে। এটা তোমাদের সমস্যা, মা। তোমরা বোঝাপড়া করো। তৃতীয়পক্ষকে ডাকা ঠিক হবে না।

সুন্দর কথা বলেন বাবা। কিন্তু তাঁর ছেলেটা সুন্দর করে বুঝতে চায় না কেন! রিজিয়ার রাগ হয়, এবং রাগের চোটেই না তা দমন করার জন্যে বোঝা গেল না, সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুন্দর একটি বারান্দা—এ পাড়ায় এমন বারান্দা দেখা যায় না। রিজিয়া দেখল শ্রাবণের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু বৃষ্টি

নেই। ওপাশের কয়েকটি বাড়িতে কয়েকটি নারকেল-গাছ—ঠাণ্ডা বাতাসে পাতাগুলো কাঁপছে। একটি পেয়ারাগাছে অজস্র পেয়ারা। একেবারে ডাঁসা—গাছেই লোভনীয় হাতছানির মতো ঝুলে রয়েছে। এমন পেয়ারা খেতে খুব মজা—রিজিয়া লোভী হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, মালিক খায়ও না, কাউকে দেয়ও না। না, খাওয়ার লোক নেই? ভদ্রলোক নতুন এসেছে। আগের পুরোনো ভাড়াটে থাকলে সে চেয়েই খেত; অবশ্য চাইতে হত না, সেতারা ভাবী নিজেই পাঠিয়ে দিত। এখন সরকারি বাসা পেয়ে চলে গেছে বেলি রোডে। কতদিন দেখা নেই। সেও যেতে পারে নি একদিন ছাড়া। দূর কম নয়—আট টাকার কম রিকশা পাওয়া যায় না—ষোলো টাকা খরচ করে বেড়ানো—মাগো—!

রিজিয়া চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। সালেহ অবশ্য গত শুক্রবারে বাজারের সঙ্গে তার নির্দেশমতো পেয়ারাও এনেছিল—কিন্তু বেশি পাকা, তার ভালো লাগে নি।

সালেহের কথাটা উঠতেই লোকটা পুরো সামনে এসে দাঁড়াল। ফর্সা-লম্বা স্বাস্থ্যবান মানুষটি। কম হাসে। কিন্তু হাসে যখন, হো হো করে। নিয়মকানুন-মেনে-চলা মানুষ। সময় সম্পর্কে সতর্ক। কেউ সময় দিয়ে সময়মতো না আসলে বা কথা না রাখলে সে ভীষণ রেগে যায়। রসকষ আছে।

বিয়ের সপ্তাহখানেক পর একদিন মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, দেখো, আমি সন্তান কামনা করি। কিন্তু দু-চার বছর পর। তুমি কী বল?

রিজিয়া অবাক হয়ে বলল, সে কী! আমার বয়স কত জান? এম. এ. পাশ করতে তিন বছর খোয়াতে হয়েছে। এত দেরিতে ছেলে নিলে—

সালেহ ওকে বাধা দিয়ে বলল, সন্তান বলো, কারণ, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তুমি জান না—

মৃদু হেসে রিজিয়া বলল, এত দেরিতে সন্তান নিলে মানুষ করবে কখন? তুমি অবসর নেওয়ার পরও দেখলে সে ভারসিটি ত্যাগ করে নি।

—আমি দেখছি তুমি আমার থেকেও বেশি মেথডিক্যাল। ভালো। তবে এ ব্যাপারে আমার কথাটা তোমাকে বিবেচনা করতে হবে।

রিজিয়া হেসে উঠল। হাসলে ওর ডান গালে টোল পড়ে। ওটা অপূর্ব সৌন্দর্য হিসেবে সালেহের কাছে প্রতিভাত হয়। এ বিপুল বিশ্বে সৌন্দর্যের কত সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি রয়েছে ভেবে সে আশ্চর্য হয়।

হাসলে যে!

না হেসে উপায় আছে রিজিয়ার! সে যেভাবে কথাটা বলল তাতে মনে হয় সে দরখাস্ত করে আবেদন জানাচ্ছে। এখন সে কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনজুর-না-মনজুরের মালিক।

মুখে বলল, না, কিছু না।

হঠাৎ রিজিয়া লক্ষ করল, সেই পেয়ারাগাছওয়ালা বাড়ির নীচতলা থেকে একজন তাকে ইশারা করছে।

রিজিয়া রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, নতুন এসেছেন?

বউটি মাথা নাড়ে।—আপনারা কই এলেন না?

—আসব।

—আমি ভেবেছিলাম নতুন কেউ এলে পড়শিরা খোঁজ নেয়। এখানে দেখছি তেমন নয়।

—তাই নাকি? আচ্ছা আসব। তা, আগে কোথা ছিলেন?

—কলাবাগান। ওখানে ভালো স্কুল নেই। তাই এ পাড়ায় এলাম।

—কোন্ ক্লাসে পড়ে?

—এই তো ফোরে। আর ছোটো জনকে সামনের বছর ভরতি করব। দুটোই ছেলে। আসবেন, কেমন?

রিজিয়া বলল, নিয়মটা ভাঙুন না, আপনিই আসুন না।

—আমি? ঠিক আছে। আমিই যাব। খুশি?

রিজিয়া হাসি-হাসি মুখে মাথা নাড়ায়।

সে সোজা রান্নাঘরে চলে আসে। কাজের মেয়ে

আছে। বাঁধা। ঠিকে-ঝি তার শ্বাশুড়ি পছন্দ করেন না। তা ছাড়া তাদের দরকারও।

—ফরিদের মা, একটু ঝোলটা মরলে মাছটা নামিয়ে দিও। তারপর ভাত চড়িয়ে দিও, কেমন।

—জ্বে।

রিজিয়া হেসে ওঠে। কথায় কথায় মহিলা কেবল 'জ্বে' বলে।

বাইরের আহ্বান-ঘণ্টি বাজলে রিজিয়াই গেল তালা খুলতে। তার শ্বশুরের বাড়িটি সুরক্ষিত। বাইরে একটা লোহার গেট। তারপর একটু হাঁটলেই আর-একটি কোলাপসিবল গেট। ওটার তালা লাগিয়ে দিলে বাড়িটি দুর্গ হয়ে যায়—নীচে-উপরে কেউ ঢুকতে পারবে না। দিনে অবশ্য খোলা থাকে—তারপর নীচেতলার প্রবেশপথ। পাশ দিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় এলে লোহার আর-একটি গেট—কোলাপসিবল—রফিকের উৎপাতে সব সময় সেটা তালা লাগানো থাকে।

কাঁধে বই ঝুলিয়ে কেয়া।

—কীরে, এর মধ্যে ছুটি? তালা খুলতে-খুলতে রিজিয়া জিজ্ঞেস করে।

সে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলে, আর বোলো না ভাবী, যা গণ্ডগোল আর মারামারি—ভাগ্যিস নাসিমা ছিল—সে চটপট গাড়িতে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে ভোঁ।

—সে কী। এত মারামারি কেন?

—ছাত্রে-ছাত্রে। সে সময় আমি বলেছিলাম ওখানকার স্কুলটায় আমাকে ভরতি কোরো না। বড়োভাই শুনলেন না, বললেন, ভালো ইস্কুল।

রিজিয়া বলল, তা গণ্ডগোল করছে কারা?

—ছাত্র। কত দল আছে—ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির, ছাত্রসংঘ, ছাত্রসমিতি—

—থাক, থাক, তোকে আর দলের নাম বলতে হবে না।

—জান ভাবী, সবার হাতে বন্দুক, রাইফেল, স্টেন, বোমা—কেউ কিছু বলতে পারে না, ভাবী—

—কে বলবে! সবাই নিজিয়, সবাই অসহায়। তবে আমরাও ছাত্র ছিলাম—এত বেশি গণ্ডগোল তখন হত না—এত ছাত্রদলও ছিল না—সবই বাড়ছে—ভায়োলেনসও বাড়ছে।

—কাল দেখো কাগজে, কত কী খবর বেরুবে। ভাবী, ওখান থেকে অন্য স্কুলে ভরতি হলে হয় না?

—ভরতি? ভরতি এত সোজা। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তোমার ভাই তোমাকে ভরতি করেছে। আর ভয়ের কী আছে? আর এক বছর পর কলেজে পড়ে অনারস পড়তে তোমাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই যেতে হবে। তাই ওর ভেতরের স্কুলেই পড়ো—অভ্যাস হয়ে যাবে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে, সিজনড হয়ে যাবে—দেখবে একদিন তুমিও কোনো-না-কোনো পক্ষ নিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছ।

—কী যে বল, ভাবী।

রাজিয়া বেগম গোসলখানা থেকে বেরিয়ে কেয়াকে দেখে বলল, আজ এত তাড়াতাড়ি এলি যে! লেখা-পড়া চুলোয় গেছে বুঝি!

কেয়া উত্তর না দিয়ে বইয়ের ব্যাগ টেবিলে রেখে কাপড় হাতে নিয়ে গোসলখানায় ঢুকল।

—ও এলাকায় খুব গণ্ডগোল, মা। তাই চলে এসেছে।

আলী সাহেব শুনে বলে ওঠেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্কুলটা। কোন্ দিন এক ফায়ারে না মেয়েটি মারা যায়!

—ছি! বাবা, এমন অলক্ষুনে কথা বলবেন না।

বউমার ধমক খেয়ে তিনি বিব্রতভাবে বলেন, সাধে কী বলি মা, দেশের অবস্থা দেখে বলি—ল অ্যানড অর্ডার কোথা আছে বলো? রাগ করে কাগজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছি, তুমি জান। আমাদের সময় এরকম ছিল না, মা।

সালেহ সেই বিকেলে ফিরবে। কিন্তু আজ বেশ

তাড়াতাড়িই ফিরল।

রিজিয়াকে ডেকে বলল, জামানকে চেন তো? ওই যে আমার নাট্যকার বন্ধু। ওর একটা নাটক আজ স্টেজ হবে। ছটো টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে। যেতে বলেছে বারবার করে।

—সেই মহিলা সমিতিতে। আসা-যাওয়ায় বিশ টাকা রিকশা ভাড়া।

—টিকিটের দাম তো লাগছে না। ধরো, ওটা দিয়ে রিকশায় যাচ্ছি।

—কেন ধরব? তার চেয়ে নাটকই দেখব না। দূরদর্শনে প্রায়ই নাটক দেখছি।

—এটা তোমার সে নাটক নয়। এগুলো হচ্ছে নিরীক্ষাধর্মী নাটক—আর যাই হোক, দূরদর্শনে দেখার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া, তুমি এত হিসেবি হয়েছ কেন বলো তো?

—কেন হয়েছি, মাসের শেষে বুঝবে।

—দোহাই, রিজু, ভয় দেখিয়ো না। মাসের শেষে আর যা চাও তাই দেব, কিন্তু টাকা চেও না।

শেষ পর্যন্ত রাজি হয় রিজিয়া। কিন্তু প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায় সালেহ। নীচের তলার বাড়িভাড়া আর পোস্ট অফিসের বাবার সামান্য অবসরভাতা দিয়ে যে সংসার চলছে না, সে বুঝতে পারে। তার কলেজের মাইনেই বা কত। সেই সদরঘাটে জগন্নাথ কলেজে যাওয়া—কম রিকশা ভাড়া? একবার সে ভেবেছিল সাইকেল কিনে ফেলবে—কিন্তু রাস্তায় দুর্ঘটনার বহর আর জঘন্য ভিড়ের কুৎসিত অভিব্যক্তি দেখে সে সাইকেল চালিয়ে কলেজে যাবে ভাবতেও পারে নি। একমাত্র পথ আয় বাড়ানো। কিন্তু পথ কই? পথ তো বন্ধ। কেন, রিজিয়া!

রিজিয়া বহুদিন চাকরির কথা বলেছে। অবশ্য চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যায়, তা নয়। তবে চেষ্টা-চরিত্র-তদবির-ঘোরাঘুরি করলে পাওয়া যে যাবে না, এ কথা বলা যায় না। রিজিয়া কয়েক জায়গায় দরখাস্তও করেছে। সাক্ষাৎপত্র অবশ্য সে পায় নি।

তবে সালেহ তার চাকরি করা পছন্দ করছে না দেখে রিজিয়া দরখাস্ত করা বন্ধ করে দিয়েছে।

বহুবার রিজিয়া ওকে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা বলো তো তোমার আপত্তি কিসে! তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, রিজু। এদেশে চাকরির পরিবেশ তৈরি হয় নি এখনও।

—কী বলছ?

—ঠিকই বলছি।

—সে কী! মেয়েরা কি কেউ চাকরি করছে না?

—করবে না কেন? স্কুলে করছে, কলেজে করছে, অফিসে করছে। কেউ ডাক্তার, কেউ প্রফেসর, কেউ নার্স, কেউ পি.এ., কেউ টেলিফোন অপারেটর।

—তুমি পরিবেশের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, তা বলছি। তবে চাকরি চাইলেই কি পাওয়া যাবে? ঐ যে তোমার বড়ো ভাইয়ের বউ—মানে আমার—হেসে ফেলে সালেহ—দু বছর ধরে চেষ্টা করছে, হয়েছে?—সেও তোমার মতো সোসিও-লজির এম. এ.।

—ভাবী পান নি বলে আমার চেষ্টা করতে বাধা কী? আসল কথা কী, তুমি বলছ না। তুমি মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ কর না। তুমি সেকেলে রক্ষণশীল।

—তুমি সব জান আমার সম্বন্ধে দেখছি। তাহলে আমার আর কী বলার আছে!

ধীরে-ধীরে তার আগ্রহও কমে গেছে। রিজিয়া এখন ঘর-সংসার করে। শ্বশুরশাশুড়ির সেবা করে। সকালে নাস্তার তদারকি করে। কেয়া আর রফিককে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে-কলেজে পাঠিয়ে দেয়। একটু বেলা হলে সালেহও বেরিয়ে যায়। তারপর দুপুরের পর থেকে অখণ্ড নীরবতা। সে তখন বই পড়ে, গান শোনে, টুকটাক সেলাই করে। সালেহের হিসেব-মতো দু-চার বছর পার হয় নি এখনও, কাজেই রিজিয়াকে সন্তান পালন করতেও হয় না।

অবশ্য সালেহ যে একেবারে অবুঝ তা নয়। সে

রিজিয়াকে বোঝাবার চেষ্টাও করেছে।

বলেছে, দেখো রিজু, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। চাকরি করলেই যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়, এটা আমি মানতে রাজি নই। ঘরসংসার-সন্তানধারণ করলে নারীর অধিকার অপ্রতিষ্ঠিত থাকে, একথাও আমি সত্য বলে মানি না। বিষয়টা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর, সমঝোতার উপর, ভালোবাসার উপর। আমি যেহেতু অর্থ উপার্জন করি, তুমি কর না, সেই-হেতু তুমি খাটো নও। কারণ তুমি চাকরি কর না ঠিক, কিন্তু ঘরের কাজ কর। আমি বাইরের কাজ করি। ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করতে পারলে আমি বাইরে যেতাম না।

রিজিয়া বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তুমি কী বলতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি।

—জানি তুমি পারবে। কারণ তুমি অবুঝ নও, অশিক্ষিতও নও। তুমি সুশিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। কিন্তু কথা হচ্ছে কী জান, তুমি উচ্চশিক্ষিতা বলে চাকরি করতে চাচ্ছ, স্বাবলম্বী হতে চাচ্ছ, অর্থনৈতিক পরাধীনতা ঘোচাতে চাচ্ছ—ভাবছ, এত লেখাপড়া শিখেছি কী জন্য—লেখাপড়াটাও দরকার মানুষ হওয়ার জন্যে, বিয়ের জন্যেও—এতে লজ্জা নেই—কারণ একজন শিক্ষিত একজন শিক্ষিতাকেই কামনা করে—নইলে সামঞ্জস্য হবে কেন—আমাদের বাবা-দাদারা করেছেন, কারণ তাঁরা শিক্ষিতা মেয়ে পাননি—

—তুমি থামবে!

—রাগ কোরো না। ভেবে দেখো অনেকেই চাকরি করে না—বড়ো বড়ো চাকুরিজীবীর স্ত্রীরা চাকরি করে না—বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী-শিল্পপতির বউরা চাকরি করে না—নেতাদের সহধর্মিণীরা চাকরি করে না—

—তারা করে না কেন?

—তাদের দরকার নেই। তারা আর্থিক দিক থেকে সলভেনট।

— তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে—চাকরি দরকার আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলে?

—ধরো তাই।

—তাহলে আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন।

—না, প্রয়োজন নয়। আমাদের চলে যাচ্ছে।

রিজিয়া আর উচ্চবাচ্য করে নি। সে বুঝে ফেলেছে ভদ্রলোককে। প্রগতির খোলসে কট্টর রক্ষণ-শীল। এবং সন্দেহপ্রবণ। ভাবে, অফিসে-আদালতে গেলে পুরুষের সঙ্গে উঠবোস করতে হবে; মেলামেশা করতে হবে—সেটি সহ্য করতে পারবেন না। আর তিনি যে মেয়েদের সঙ্গে উঠবোস করেন, মেলামেশা করেন—তা দূষণীয় নয়! কই, সে তো এজন্যে ঈর্ষান্বিতা নয়! অবশ্য রিজিয়া জোর করে চাকরি নিতে পারে; তার এক মামাতো বোন অর্থনৈতিক কারণে তিন ছেলে বড়ো হওয়ার পর নিতে যেমন বাধ্য হয়েছিল—বিয়ের প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পর। কিন্তু তার স্বামী এটা মেনে না নেওয়ায় গৃহে অশান্তি ছিল—রিজিয়া তা চায় না। সে মিলমিশ করেই থাকতে চায়।

রিজিয়া কাপড়চোপড় পরে প্রস্তুত হয়েও দেখে, সালেহ শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছে।

—কী, তুমি যাবে না?

—বই থেকে মুখ না সরিয়ে সে বলল, আমি রেডি, তুমি রেডি হয়ে নাও।

—মশাই আমি রেডি, তুমি রেডি হও।

বইটা রেখে দিয়ে সালেহ তাকিয়ে বলল, বাঃ, বড্ড সুন্দর লাগছে তোমাকে।

—উঠবে, না ইয়ারকি করবে?

—দেখো কাণ্ড! ভালোকে ভালো বলতে পারব না?

ওরা বেরুতে দেখে গেটের সামনে একটি মেয়ে। কলিংবেলে হাত দেবে, এমন সময় ওদের দেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, এটা কী সালেহ সাহেবের বাসা?

—হ্যাঁ।

—আসো, ভেতরে আসো।

রিজিয়া তাকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে পড়ে না। ওর মনে হল সালেহ চেনে। কিন্তু সালেহও তাকে চেনে না।

মেয়েটি ভেতরে না ঢুকে একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয় সালেহের দিকে।

চিঠির হস্তাক্ষর বোঝা মুশকিল। বুঝে ওঠার আগে সে নীচে নাম দেখল কবীর।

কবীর পাঠিয়েছে। ততক্ষণ তার চিঠিটা পড়া হয়ে গেছে। সে রিজিয়ার হাতে দিল।

মেয়েটির ঘাড়ে একটা ব্যাগ, পায়ের কাছে একটা সুটকেস।

কেয়া বলল, ভেতরে এসো।

ড্রইং রুমে বসিয়ে সে বলল, কবীর স্যারের সঙ্গে হলের সামনে দেখা। আমি তখন রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি কোথা যাব। এমন সময় দেখি স্যার হন্তদন্ত হয়ে কোথা যাচ্ছেন। আমি স্যারকে ডেকে আমার বিপদের কথা বলতেই তিনি খশখশ করে একটা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন, সোজা রিকশা নিয়ে এই ঠিকানায় চলে যাও। আজিমপুর রোড ধরে যাবে। এ রোডটি শেষ হতেই শেখ-সাহেবের বাজার—প্রথম দোতলা বাড়িটি। তিনি নিজে রিকশা ডেকে দিলেন।

—এত কষ্ট করল সে। সে তো তোমাকে কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে পারত।

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

রিজিয়া বলল, কী বলছ! তোমার বন্ধু ব্যাচেলার না?

—ওঃ! সরি।

—জানেন, দুটো ছেলে মারা গেছে। আর-একজন রিকশাওয়ালা। তারপর দুই ঘণ্টার মধ্যে হল খালি করার অর্ডার। কী মুশকিল বলুন তো। রিকশাও পাওয়া যায় না ও এলাকায়।

—যাক, তুমি এখানেই থাকো। কবীর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। খুব ভালো কাজ করেছে সে।

—আমি কিন্তু আজ রাতটা থাকব। কাল সকালে যাব।

—কোথায় যাবে?

—বাড়ি। আমাদের বাড়ি পাবনা।

—আচ্ছা, তা দেখা যাবে। রিজিয়া বলল। তোমার আব্বার নামে একটা টেলিগ্রাম করে দিই।

—তা লাগবে না। তার আগেই আমি কাল পৌঁছে যাব।

—তা বটে। যা সিস্টেম আমাদের। টেলিগ্রাম পৌঁছুতে-পৌঁছুতে তুমি হাজির। তারপর সেটা পৌঁছল। কী কাণ্ড। সালেহ হেসে ওঠে।

রিজিয়া বলল, চলো, ভেতরে চলো। সে সুট-কেসটা হাতে নেয়।

—আমাকে দিন, আপা।

—ঠিক আছে, এসো। তোমার নাম কী।

—শর্মিলা।

—বাঃ সুন্দর নাম, দেখতেও সুন্দর তুমি।

—আমি সুন্দর? কী যে বলেন। আপা, আপনি দেখেছেন নিজেকে?

—আম্মা—এই যে শর্মিলা—সংক্ষেপে সব কথা বলে দেয় সে শাশুড়িকে—কেয়া, শোনো—তার সাথে আলাপ করিয়ে দেয়—তুমি বসো, কেমন—আমরা একটা কাজে বেরিয়েছি—তুমি থাকো, কেমন—নিজের বাড়ি মনে কোরো—কেয়া খেতে দিস—আমি আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে আসব। মা—আপনি রান্নাঘরে যাবেন না—আমি এসে যা হয় করব।

—আচ্ছা তুমি যাও, দুটো বাজতে মাত্র পনেরো মিনিট আছে···

সালেহ তখন রাস্তায়। রিকশায় বসে।

রিজিয়া গেটে তালা লাগিয়ে তরতর করে সিঁড়ি ভাঙে।

নাটক তখন আরম্ভ হয়ে গেছে।

বিরতির সময় নাট্যকারের সঙ্গে দেখা।

সে ওদের দেখে এগিয়ে এল—কেমন লাগছে, ভাবী?

—বেশ ভালো। ভাবী কই?

—আপনার ভাবী অভিনয় করছে না!

—ওঃ! হেসে ওঠে রিজিয়া।

—সালেহ দেখো। আমি···

—তুমি যাও, পরে কথা হবে।

—তারপর, অধ্যাপক সাহেব?

ঘাড় ঘুরিয়ে রিজিয়া দেখে মিতা মিটিমিটি হাসছে। তার সহপাঠিনী।

—উঃ কতদিন পর দেখা। তুমি আসথিয়েটারে? মিতার স্নিগ্ধ হাসি। বড়ো দামি শাড়ি পরনে। সুগন্ধি নাকে লাগছে।

—অনেকদিন পর এলাম। নাট্যকার ওর বন্ধু। টিকিট দিয়েছিলেন দুটো।

—বাঃ, ভালো বন্ধু দেখছি। কে করে একালে? তারপর কী করছ? ঘর?

—হ্যাঁ। তুমি শিশু একাডেমীতে?

—আর কোথা যাব। ভালো চাকরি পাওয়ার কি উপায় আছে!

—তা ঠিক। জহরত কোথা জানিস?

—সে তো বিয়ের পরই আমেরিকায়। আর ঝরনা জেদ্দায়। ওর স্বামী ইনজিনিয়ার। প্রচুর মাইনে।

ওরা গেটের দিকে এগুতে থাকে; নাটকের বাকি অংশ তখনও বাকি।

ওরা ফিরে আসতেই ভাবীর কাছে দৌড়ে এল কেয়া: জান ভাবী, কী সুন্দর না শর্মিলা আপা! গান জানে। আমাদের শোনাল: জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। আর যা মজার-মজার গল্প জানে। কিন্তু কালই চলে যাবে। ভাবী, আর-একদিন থাকতে বলো না!

—কী কাণ্ড! পরের মেয়েকে শুধু-শুধু আটকানো যায়? তাছাড়া ওর বাবা-মা কাল কাগজে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে যাবে। উদ্বেগে অস্থির থাকবে না তাদের মেয়ের জন্যে?

—তা বটে। তবে যাক। পরে আসতে বলব। ছাড়ব না আমি না এলে।

—পাগলী মেয়ে!

—আর-একটা কথা বলল, জান ভাবী—

—বলে ফেল তাড়াতাড়ি, আমার কাজ আছে।

—শর্মিলা আপা এম. এ. পাশ করে ল পড়বে। অ্যাডভোকেট হবে।

—বাঃ।

রিজিয়া কাপড়চোপড় ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল ঝিটাকে নিয়ে তার শাশুড়ি সব কাজ সেরে বসে আছেন।

—এত ভালো মা! রিজিয়া খুব খুশি হয়।

পরের দিন সালেহ শর্মিলাকে নিয়ে টিকিট কেটে বাসে চড়িয়ে দিয়ে কলেজে গেল। রিজিয়া খুব খুশি হল। মানুষটার দয়ামায়া আছে। শুধু তার ব্যথাটা বোঝে না।

আস্তে-আস্তে রিজিয়ার সয়ে গেল। এখন তার এই ঘরসংসার ভালো লাগে। মাঝে-মধ্যে পাড়া বেড়ায়। মায়ের বাসায় যায়। বড়ো বোনের বাসায় যায় কখনও-কখনও। চাকরির কথা ভাবে না। বরং তার মনে হয়, বাসে-রিকশায় চড়ে, সাততাড়াতাড়ি নাস্তা খেয়ে—তাও সাতটার মধ্যে—অফিসে যাওয়া—দুটোর পর কষ্ট করে খিদে নিয়ে অধিকতর কষ্ট করে রিকশা খুঁজে নিয়ে বাড়ি আসা ঘর্মাক্তকলেবরে—না, তার চেয়ে এই ঘরই ভালো। এমনি করে রিজিয়ার জীবন চলতে-চলতে একদিন সে বুঝতে পারল তার সন্তান এসেছে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে এলেও সালেহ খুব খুশি হল। একবারও বিরক্তি প্রকাশ করল না। একবার বলল না তোমার শরীরের বাঁধুনি নষ্ট হয়ে যাবে বা তোমার সৌন্দর্য কমে যাবে। একটু অবাকই হল

রিজিয়া।

যথাসময়ে রিজিয়ার একটা ছেলেই হল।

মাস ছয়েক যেতে নিলুফার বেগম বললেন, গোরুর দুধ লাগবে, সালেহ। বউমার বুকে দুধ নেই।

—গোরুর দুধ—সে তো মা ভেজাল। পানি মেশায়, নইলে পাওডার দেয়।

—না, না, খাঁটি গোরুর দুধ।

—কোথায় পাব? খাঁটি দুধ কি বাংলাদেশে আছে, মা!

—আছে। বাংলাকে তুচ্ছ কোরো না। টাকা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়।

—সালেহ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি খোঁজ করছি।

—তোমাকে খোঁজ করতে হবে না। আমি খবর পেয়েছি দোয়েলরা গোরুর দুধ নেয়। ওরাই খবর দিয়েছে। চিনেছ? আজিমপুরে ওই যে চাইনা বিলডিঙের কাছে—তোর বাবার বন্ধু রহিম সাহেবের বাড়ির ভাড়াটে। দোয়েলের মা বউমার পরিচিত। ওর দুই ছেলেমেয়ে। তা এক কাণ্ড ঘটেছে, শোন্। ওরা দু বছর ধরে খাঁটি গোরুর দুধ খাচ্ছে—পাড়ার আরও কয়েকজন খাচ্ছে—লালবাগের এক গোয়ালা নিজে বাড়ির সামনে দুয়ে দুধ দিত। ওর বালতিতে যে দুধ থাকত কিছুটা তাতে সে দুধ দোয়াত। কেউ খেয়াল করেও করে নি। হঠাৎ একদিন টিভিতে দুধ-পানি-মেশানো এক বাস্তব খবর দিল। আর যায় কোথা! দোয়েলের মা চেপে ধরল গোয়ালাকে। সে স্বীকার করে বলল, খাঁটি দুধ নিলে বিশ টাকা সের পড়বে। এতদিন দিত বারো টাকায়। শেষে ঠিক হয়েছে আঠারো টাকায়। আমি ঠিক করেছি একসের করে নেব।

—মা তুমি ঠিক করেছ যখন তখন আর কথা কী। কিন্তু মা, দূরদর্শনের ওই মজার কাণ্ডটা তো আমি দেখি নি।

—তুই কোন্ মিটিঙে গিয়েছিলি। কী কাণ্ড জানিস। বাড়ির ভেতরে বালতি-বালতি পাওডার দুধ। আর বাইরে অনেক গোরু। দুধ দোয়ায় আর দেয় আর মাঝে-মধ্যে ভেতর থেকে নিয়ে আসে। ক্রেতা তো খাঁটি খাচ্ছে আনন্দে দুধ নিয়ে দৌড়চ্ছে। কত কাণ্ড হচ্ছে।

—মা, এটা খাঁটি তো? না বিদেশী শিশুখাদ্য দুধ কিনব?

—চেতোনবিলের? বলিস কী!

—না মা, এসব অস্ট্রেলিয়ার।

—তুই এক মূর্খ। সব পাউডার দুধ। সিঙ্গাপুরে কৌটার মধ্যে পুরে তোদের দেশে পাঠিয়ে দেয়। আর তোরা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে, এই আনন্দে নাচতে শুরু করিস।

—তুমি এত খবর পাও কোথা থেকে?

—দেখো কাণ্ড। এসব তো কাগজে বেরিয়েছে।

যাইছে বেরুকগে কাগজে। কিন্তু সে কী করবে। দুশটাকা লাগবে কেবল দুধে। কী দুঃ সময়ে শিশু এল।

কলেজে সহকর্মী রমজানকে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপনার দিন চলে কী ভাবে?

—মানে?

—মানে, এই মাইনেতে চলে?

—পাগল হয়েছেন আপনি। মাইনেতে দিন চলবে! ও টাকায় সাহেব খাওয়া চলে—ভাত-ডাল। তারপর কাগজ-কলম-ছেলের মাইনে—কাপড়চোপড়-গামছা-গেনজি—মায় আমার জাঙ্গিয়া—সব অন্য টাকায় কিনতে হয়।

—অন্য টাকায় মানে?

—অন্য টাকায় মানে বুঝলেন না? আপনি একেরে নাবালক দেখি। আরে ভাই, ঘুষ-দুর্নীতি—উঞ্ছবৃত্তি, ইতরামি, ছ্যাঁচড়ামি-দালালি করে যেসব টাকা পাওয়া যায় তাই দিয়েই আমাদের ফুটানি। নইলে বাঙলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অফিসারের চলে ক্যামনে। তার মাইনে তো দু হাজার। কেউ-কেউ অবশ্য পার্ট-টাইম চাকরি করে। কেউ ব্যাবসা, কেউ

হোমিওপ্যাথি।

রমজানের এই দোষ। কথা বলা শুরু করলে থামতে চায় না।

অসহিষ্ণু সালেহ বলল, আপনার চলে কেমন করে?

আমি স্বনামে বেনামে নোট লিখি যে! রচনাবই লিখি। আরো ফুসফাস-টুসটাস আছে। আপনি লিখবেন নাকি?

—না, নোটবই লিখব না।

—ব্যাবসা করবেন?

—ব্যাবসা?

—হ্যাঁ, টাকা ঢালুন। মাসে-মাসে লভ্যাংশ পাবেন—স্লীপিং পার্টনার।

—অত টাকা কোথা পাব?

—তাহলে আপনার উদ্ধারের পথ নেই। নিন, সিগারেট খান একটা। মাথা পরিষ্কার করে ভাবুন।

সিগারেট খায় না সালেহ। তবুও একটা নিল।

সুন্দর কায়দায় রমজান সিগারেটের পোঁদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নিজেরটাও ধরিয়ে নিল।

বড়ো দীর্ঘ একটা টান দিয়ে সালেহ কাশতে লাগল।

রমজান হাসতে-হাসতে বলল, আস্তে। কোনো কাজেই হন্তদন্ত হতে নেই, তাড়াহুড়া করতে নেই। যাই, বানরদের সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করে আসি।

ক্লাস রেজিসটার তুলে নিয়ে রমজান আলী শিক্ষক-বিশ্রামাগারকক্ষ ত্যাগ করে।

আর সালেহ ভাবতে থাকে। তার কপালে প্রথমে এক ভাঁজ পড়ে, তারপর দুভাঁজ। তার মাথা ধরে। কান ঝাঁ ঝাঁ করে। শরীরে ক্লান্তি জাগে।

রিজিয়ার ছেলেটি বড়ো সুন্দর হয়েছে, আর খুব দুরন্ত। সারাদিন তার কাটে ছেলেটিকে নিয়ে। ওর চাচা, সালেহর ছোট, বেলায়েত নাম দিয়েছে রবি—দাদীও তা পছন্দ করেছে। কেবল কেয়া বলেছে রবি একটা নাম হল—রাখো স্বপ্ন—বেলায়েত খেঁকিয়ে উঠেছে—স্বপ্ন একটা নাম হল—তার চেয়ে রত্ন বলতে পারিস—শেষে রেগেমেগে কেয়া অভিধান ঘাঁটতে থাকে—ততদিনে রবি নাম চালু হয়ে গেছে।

সালেহ লক্ষ্য করে রিজিয়া তার কাছে ভেড়ে না বললেই চলে—যত কাজ তার ছেলেটাকে নিয়ে। এই দুধ খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে—ময়লা কাপড়চোপড় মেলে দিচ্ছে। তার জামা তৈরি করছে, কখনও প্যান্ট—তার ফুরসত কই?

সালেহ একটু অবাক হল। মায়ের এ কি ভালোবাসা, না সন্তানগ্রাস? এটা কি বাড়াবাড়ি, না বাস্তবাভিব্যক্তি?

শেষে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। যা ইচ্ছে করুক রিজিয়া। কিন্তু তার সমস্যা-সমাধান কিভাবে হবে!

একদিন তার কোলে রবিকে দিয়ে বলল,—মাঝে-মাঝে দেয়—সেও কখনও কখনও নিজেই নেয়—প্রায় সময় অবশ্য দাদী-ফুপু-মার কোলে—বেশ মজায় আছে ছেলেটা—ধরো তো, আমি আসছি।

গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলে হঠাৎ সে রিজিয়াকে বলল, চাকরির কথা কই আর বল না। ছেলে পেয়ে ভুলে গেলে?

—চাকরি! না বাপু, চাকরি করব না। একে দেখবে কে?

—কেন, ওর দাদী-ফুপু।

—না, না, তা হয় না। কখন কী করবে রবি, যা দুরন্ত—সামলানো ওঁদের কাজ নয়। তা ছাড়া এতদিন মানা করেছ, এখন কেন সাধছ?

—ভেবে দেখলাম তোমার যুক্তিই সঠিক। নারীর সত্যিকার অধিকার, 'পারসোনালিটি ডেভেলপ'-এর জন্যে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজন আছে।

—এ কী কথা শুনি মন্থরার মুখে? অধরে চাপা হাসি রিজিয়ার। বড়ো সুন্দর লাগছে। এ কি মাতৃরূপ? আর আগেরটি কি স্ত্রীরূপ? সালেহ ভাবতে থাকে।

—ঠাট্টা রাখো, করবে কিনা বলো।

—চাকরির ছ-চারটা অ্যাপয়নমেনট লেটার তোমার পকেটে আছে মনে হচ্ছে?

—না, তা নেই। তবে তুমি বললে আমি চেষ্টা করতে পারি।

মনে মনে হাসল রিজিয়া: হায় রে পুরুষ! অহমিকা যায় না। মুখ ফুটে বলতে পারছে না তার জ্বালা—রিজু, আমি আর একা এ-সংসার চালাতে পারছি না, তুমিও দায়িত্ব নাও; এসো আমরা দুজনে এ-জীবনসংগ্রামে শরিক হই।

রবি তখনও তার কোলে। নিজের কোলে তুলে নিয়ে সালেহের বিমর্ষ-চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে মৃদু হেসে গ্রীবা বেঁকিয়ে কানের দুল দুলিয়ে আলতো স্বরে রিজিয়া বলল, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি তোমার ছেলেকে মানুষ করব।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এ পাড়ার কাকগুলো ফিরে এসে গুটিকয় আম-নারকেল-সুপারি গাছের ডালে বসে কা-কা রব তুলে কী বলতে চাচ্ছে কে জানে।

বাংলাদেশ

শিক্ষা যখন ব্যাবসার পণ্য

অভিজিৎ করগুপ্ত

এক

মাস দেড়েক আগের কথা। অকাদেমী অব ফাইন আর্টস-এ দুটি একাঙ্ক নাটক দেখতে গেছি। প্রথম নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল এক অবসরপ্রাপ্ত কলেজ প্রিনসিপালের একাকিত্ব। এক সময় দেখা যায়, ওই প্রিনসিপালের পুত্র এবং কন্যা ব্যর্থ প্রেমের নৈরাশ্য নিয়ে বিপত্নীক বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে দূরে চলে যাচ্ছে। নাটকের শেষ লগ্নে আমরা দেখি, একাকিত্বের তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত প্রিনসিপাল প্রায় পাগলের মতো এক প্রাক্তন ছাত্রকে ডাকছেন সঙ্গ পাবার লোভে। আমার ঠিক পেছনেই বসে ছিলেন দুই যুবক। যে কোনো কারণেই হোক, একাঙ্কটি তাঁদের ভালো লাগে নি; আর এই ভালো না-লাগাই প্রকাশ পেয়েছিল একটি অদ্ভুত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে: 'অত ডাকাডাকির কী আছে? দরজায় একটা সাইনবোর্ড লটকে দিন না—"প্রাক্তন প্রিনসিপাল -পরিচালিত কোচিং সেন্টার"। খাটালের মতো ভরে যাবে ঘর। দু-পয়সা আয়ও হবে আর একাকিত্বের যন্ত্রণাও হাওয়া হয়ে যাবে।' নাটক ভালো লাগা বা না-লাগার গণতান্ত্রিক বা সাংস্কৃতিক অধিকার ওই যুবক-দুজনের নিশ্চয়ই আছে, এবং তা নিয়ে লেখকের কোনো প্রশ্ন নেই। শুধু ওই মন্তব্য থেকে তুলে আনতে চাই দুটি বিশেষ শব্দকে—'কোচিং-সেনটার'। এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু হল আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় কোচিং এবং টিউটোরিয়াল হোমের প্রভাব। পূর্বোক্ত একাঙ্ক নাটকের প্রিনসিপালের মতো শিক্ষকরা এখন আর একাকিত্বে ভোগেন না, তীর্থের কাকের মতো তাঁদের বসে থাকতে হয় না কোনো প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোর জন্য। কখনো বাড়িতে একা, কখনো-বা আরো কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে যৌথভাবে খোলা হয় 'কোচিং সেনটার' বা 'টিউটোরিয়াল হোম'। কলকাতা মহানগরীর আনাচে-কানাচে বোরোলীন, উষা ফ্যান, ফ্রুটি ড্রিংকস বা ওই ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপন-সংবলিত

হোর্ডিং বা ব্যানারের মতো এইসব কোচিং সেনটার বা টিউটোরিয়াল হোমের বিজ্ঞাপনের সঙ্গেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমাদের চোখ। শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট, খিদিরপুর, মানিকতলা—কোথাও এদের খোঁজে বেশি বেগ পেতে হয় না। 'ফর বেটার রেজালট জয়েন···' 'আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে···' প্রভৃতি ভাষায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন আমাদের কাছে রঙিন টি. ভি., ফ্রিজ বা প্রধানসামগ্রীর বিজ্ঞাপনের মতোই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আসলে দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এদেশের শিক্ষাকে একটা সর্বাঙ্গীণ পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করবার কাজ প্রায় নির্ভুল এবং সুচারু রূপে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। কোচিং, টিউটোরিয়াল বা ওই ধরনের মূলস্রোতবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলি এই নগ্ন বেসাতিরই এক-একটি অনুষঙ্গ। আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, এদের প্রভাব অপরিসীম। গত কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা এবং মফসসল শহরগুলিতে এই ধরনের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্রুত বিস্তার বীজগণিতের গুণোত্তর প্রগতিকেও হার মানায়। মাধ্যমিক থেকে মাসটার ডিগ্রী, জয়েনট এনট্রানস আই-এস-এস, ডবলু-বি-সি-এস, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কলকাতা এবং মফসসলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে টিউটোরিয়াল হোম, কোচিং সেনটার বা বিভিন্ন করেসপনডেনস কলেজের আবেদন এক দুরন্ত গতিতে ক্রমবর্ধমান, শুধুমাত্র ভালো রেজালট নয়, ন্যূনতম নমবর পেয়ে পাশ করার তাগিদেও লক্ষ-লক্ষ ছাত্রছাত্রী ছুটে যাচ্ছেন এইসব প্রতিষ্ঠানের দিকে; এঁরাই, এর ব্যাবসার প্রধান টারগেট। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাগিদে কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের প্রতি এই আকর্ষণের একটি বাহ্যিক কারণ হল এক ধরনের অনিশ্চয়তাবোধ। কেননা, বহু ক্ষেত্রেই কোচিং-পরিচালকরা দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় পাশ বা ভালো রেজালট করার জন্য এঁদের নোটস বা সাজেসশনস অব্যর্থ। এইভাবেই এইসব কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোম বিজ্ঞাপিত করে নিজেদের। সব-ক্ষেত্রেই যে সংবাদপত্র, সাইনবোর্ড বা হোর্ডিং ব্যবহার করা হয় তা নয়; অনেক সময়ই এদের প্রশস্তি ছড়িয়ে যায় মুখে-মুখে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে তুচ্ছ বলে মনে হলেও আদৌ এটা তা নয়। এইসব প্রতিষ্ঠান কী করে বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রের পূর্বাভাস দেন, যা অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনক-ভাবে মিলে যায়, তা নিয়ে বিতর্ক তোলা যেতে পারে। 'কোচিং' কর্মকর্তাদের মতে, এটা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। আবার কারো কারো অভিমত, এই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণীর মূলে রয়েছে চরম দুর্নীতি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি যে-কোনো সচেতন মানুষকেই এইসব প্রতিষ্ঠানের সততা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে সন্দিহান করে তোলে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে হয় না। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে হঠাৎই গজিয়ে ওঠে এরকম একটা কোচিং সেনটার। কলকাতার প্রায় তিনটি প্রথম সারির দৈনিকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক জয়েনট এনট্রানস এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলির জন্য এরা প্রাইভেট এবং রেগুলার পরীক্ষার্থীদের সাজেসশনস বিক্রি করতেন। অবশ্য পুরো ব্যাপারটা যাতে সাংঘাতিকভাবে দৃষ্টিকটু না হয়ে যায় সেজন্য একটা নামমাত্র কোচিংএরও ব্যবস্থা থাকত সঙ্গে। এঁরা দাবি করতেন, কোনো পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে তাঁকে পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হবার মতো হতাশা-ক্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এদেশে কম নয়। আর সেই হতাশাই হয়ে উঠেছিল ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যাবসার মূলধন। বেশ কিছুকাল জাঁকিয়ে ব্যাবসা করার পর ওই টিউটোরিয়াল হোম বা কোচিং সেনটারের স্বঘোষিত প্রিনসিপাল ওরফে মালিককে পুলিশ

গ্রেপ্তার করে জাল মার্কশীট বিক্রির অভিযোগে। এ ঘটনা হয়তো অনেকেরই জানা। এরকম বহু দুর্নীতিই লুকিয়ে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। হতাশা আর গ্লানিতে আচ্ছন্ন আজকের তরুণ-তরুণী। চারপাশে ছেয়ে থাকা অন্ধকার আর অনিশ্চয়তার মাঝে এঁদের জীবনে এইসব প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে ঠিক যেন মরীচিকার মতো।

শিক্ষা নিয়ে এই অবাধ ঘৃণ্য ব্যাবসার আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে একজন সংবেদনশীল মানুষের মনে অনিবার্যভাবেই একটি প্রশ্ন এসে ধাক্কা মারবে: আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে কোচিং, টিউটোরিয়াল হোম বা ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার উৎসটি কোথায়?—শিক্ষাব্যবস্থার মূল প্রবাহের ধারক এবং বাহক বলে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলগুলিতে কি আদৌ কোনো পড়াশোনা হচ্ছে না—যার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে হাত বাড়াতে হচ্ছে? বস্তুত, কলকাতা শহরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে আমরা দেখব যে এই বিশাল শহরের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রায় বেপরোয়াভাবে এগিয়ে চলেছে টিউটোরিয়াল হোম এবং কোচিংএর মাধ্যমে শিক্ষা বিক্রির ব্যবস্থা। এই সমান্তরাল প্রবাহ নিঃসন্দেহে মূল শিক্ষাকাঠামোর অস্তিত্ব এবং গুরুত্বের প্রতি এক অশুভ চ্যালেনজ।

দুই

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোচিং, টিউটোরিয়াল হোম এবং রকমারি করেসপনডেনস কলেজগুলি ইতিমধ্যেই একটা নিজস্ব মানচিত্র তৈরি করে নিয়েছে। আলোচনার ভূমিকা বা প্রাথমিক পর্বেই আমরা সেই মানচিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি। এবার আসুন এই কোচিং-দুনিয়ার অভ্যন্তরে একটু ডুব দেওয়া যাক। আমাদের আধুনিক শিক্ষার এই বিচিত্র প্রত্যঙ্গকে একটু কাটা-ছেঁড়া করে এর প্রকৃতি, বৈচিত্র্য এবং ক্রম-বর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পরিচিত না হলে বিষয়টির গুরুত্বই অস্পষ্ট থেকে যাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে-থাকা এই প্রাইভেট বা বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষের সংখ্যা খুব বেশি না থাকা সত্ত্বেও এদের প্রকৃতি বা বৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন করে জানার কী আছে বা থাকতে পারে? উত্তরে বলতে চাই, আছে—কেননা, সাধারণ দৃষ্টিতে এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যতটুকু ধারণা জন্মায়, আঙ্কিরক অর্থেই নগণ্য। অস্পষ্ট এবং ভুল ধারণার মানুষের সংখ্যাও কম নয়। বস্তুত, জীবনচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ এত বেশি জটিল এবং পণ্যমুখী হয়ে পড়েছে যে জীবনের অতি সংবেদনশীল ক্ষেত্র 'শিক্ষা'-তে এসেও আমরা চূড়ান্তভাবে দিশেহারা। কর্মব্যস্ত এবং বহুবিধ সমস্যায় আক্রান্ত অভিভাবক তাই সন্তানকে এইসব কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন, দায়িত্ব সম্পাদনের আনন্দে তৃপ্তি বোধ করেন। ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত শিক্ষালাভ হচ্ছে কিনা তা দেখবার মতো অবকাশ শতকরা নব্বই ভাগ অভিভাবকেরই নেই। অনেকেই এসব প্রতিষ্ঠানকে সাফল্য লাভের সহজ উপায় বা শর্টকাট টু সাকসেস বলে মনে করেন।

বিভিন্ন রকম কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের গঠন এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গঠনবিন্যাসের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ছটি বিভিন্ন স্তরবা শ্রেণীতে বিন্যস্ত—(১) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) উচ্চ-মাধ্যমিক, (৪) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর, (৫) সমাজকল্যাণমুখী শিক্ষা, (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

উপরোক্ত ছ-টি স্তর ছাড়াও কিছু বিশেষ শ্রেণী আছে আমাদের শিক্ষা-কাঠামোতে, কিন্তু সেগুলি বর্তমান আলোচনার আওতায় পড়ে না। তালিকাভুক্ত পঞ্চমশ্রেণীটি অর্থাৎ সমাজকল্যাণমুখী শিক্ষা, এদেশে

এখনও প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া ব্যবসায়িক সম্ভাবনা কম থাকায় এই বিশেষ 'শিক্ষা'ক্ষেত্রে এখনও কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রই আমাদের আলোচ্য।

বিভিন্ন রকম সরকারি, বেসরকারি, বৈতনিক, অবৈতনিক এবং নারসারি স্কুল নিয়ে তৈরি হয়েছে এ রাজ্যের প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, শিক্ষার এই প্রারম্ভিক ক্ষেত্রটি এখনও কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের লক্ষ্য-বস্তু হয়ে ওঠে নি। একটু তলিয়ে দেখলেই এই ধারণার ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষাকে এই সূচনাপর্ব থেকেই এক পণ্য তৈরি করার কাজ শুরু হয়। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যার গরিষ্ঠতম অংশটি অবশ্যই ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হাজার-হাজার গ্রামে কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোম যে এখনও সঠিক অর্থে আত্মপ্রকাশ করে নি, তার একমাত্র কারণ এখানকার অর্থ নৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতার অনুপস্থিতি। গ্রামের কৃষক, খেতমজুর এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মেহনতি মানুষ সন্তানকে সরকারি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই শেষ করেন দায়িত্ব। স্কুলবহির্ভূত কোচিং এই শ্রেণীর কাছে আক্ষরিক অর্থেই সামর্থ্য এবং চিন্তার বাইরে। এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্কুলেই সাঙ্গ করে শিক্ষা-জীবন। অর্থ নৈতিক দৈন্য এদের কাছে শিক্ষাকে আজও অপরিচিত রেখে দিয়েছে। স্বভাবতই নিম্ন-বিত্ত বা বিত্তহীন এইসব মেহনতি মানুষের বিপুল সংখ্যাধিক্যে গড়ে ওঠা গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থায় ঘাঁটি গাড়বার কোনো তাগিদ কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোম স্রষ্টাদের নেই। যে কারণে গ্রামে টি. ভি., ফ্রিজ-এর শোরুম নেই, বিউটি পারলার নেই, কিছুটা ঠিক একই কারণে গ্রামবাঙলায় কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোম নেই। গ্রামের বিত্তবান এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামর্থ্য থাকলেও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য এই ব্যাবসা লাভজনক নয়। তা ছাড়া, এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাঝারি বা বড়ো শহরে চলে আসে শিক্ষার জন্য। যারা গ্রামে থাকে তাদের জন্য যৌথ কোচিং-ব্যবস্থার চেয়ে 'প্রাইভেট টিউটর'-প্রথাই বেশি চালু।

চিত্রটি ধীরে-ধীরে বদলাতে থাকে যখনই আমরা গ্রামের পরিধি ছাড়িয়ে ছোটো, মাঝারি বা বড়ো শহরে প্রবেশ করি। সরকারি বৈতনিক এবং অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি চোখে পড়ে কিছু প্রাথমিক বা প্রাক্-প্রাথমিক নারসারি-কেজি স্কুল। শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই এদের 'শিক্ষামাধ্যম' ইংরাজি। এইসব নারসারি-কেজি স্কুলের পরিচালকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। স্রেফ মুনাফাই এঁদের লক্ষ্য। সন্দেহ নেই, এও এক ধরনের কোচিং প্রণালী। মফসসলের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা এইসব স্কুলে আসে মূলত ইংরাজিতে পটুত্ব অর্জনের জন্য। বড়ো শহরগুলিতে আজকাল এ ধরনের নারসারি-কেজি স্কুল প্রায় অলিতে-গলিতে। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার আবির্ভাবের যুগে ঠিক একই কায়দায় কিছু বৈতনিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। নারসারি-কেজি স্কুলগুলি প্রকৃত অর্থে অতীতের সেই ধারারই একটি শাখামাত্র। প্রাক্-প্রাথমিক বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে নিয়ে ব্যাবসার আনুপাতিক হার তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য স্তর বা পর্যায় থেকে কিছুটা পেছনে। এর একটি কারণ, দেশের সামগ্রিক শিক্ষাবিস্তারের হতাশাব্যঞ্জক রূপ। সরকারি ভাষ্য থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, 'বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, সমগ্র জনবসতির এক-পঞ্চমাংশের জন্য কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। যেখানে বিদ্যালয় আছে, তার ৪০ শতাংশের কোনো পাকা বাড়ি নেই। ৩৯'৭২ শতাংশের জন্য ব্ল্যাকবোর্ড নেই। ৩৫ শতাংশ

বিদ্যালয়ে একজনমাত্র শিক্ষক।...যারা স্কুলে ভরতি হয় তাদের শতকরা ৭৭ ভাগ অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। সরকারি ভাষায়, এই দুরবস্থার প্রধান কারণ—সম্পদের অভাব। আসলে বল্গাহীন শোষণে মৃতপ্রায় এই জনসমষ্টিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন করে শোষণের মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মৃতের শরীর থেকে রক্ত শোষণ করার মতো অযৌক্তিক উদ্যমের দিকে তাই কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের চতুর পরিচালকরা খুব সংগত কারণেই পা বাড়ান না।

প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক, বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এসে কোচিং ছুনিয়া বিকশিত হয় তার যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে। নোট, সাজেশন্স এবং গাইড—সব কিছুই শিক্ষার এই পর্যায়ে এসে পুরোপুরি পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বস্তুত, শিক্ষাক্ষেত্রে এই সময় থেকেই ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবিকার দিক নির্দিষ্ট হতে থাকে। এই সময় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জয়েনট এনট্রান্স এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য শহুরে মধ্যবিত্ত অভিভাবক সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কেনবার তাগিদে মরিয়া হয়ে পড়েন। কোচিং, টিউটোরিয়াল হোমগুলিও নিজস্ব পসরাকে উজাড় করে দেয় পয়সার বিনিময়ে। এদের চোখঝলসানো প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক উভয়েই সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। কোথাও বা থাকে শুধুমাত্র পাশ করার তাগিদ। সবক্ষেত্রেই কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমগুলি পরিগণিত হয় সাফল্যের রূপদাতা হিসেবে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রেণী-মানসিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'ইঁদুর দৌড়ে'র প্রবণতাকে প্রায় নিড়ে নিয়েই আজকের বেসরকারি ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। প্রতিযোগিতার অন্ধ আবেগে মানুষ মেনে নেয় এইসব প্রতিষ্ঠানের দেওয়া প্রতিশ্রুতিমালার যুক্তিগ্রাহ্যতাকে। এর ফলে লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে হারিয়ে ফেলে জীবন সম্পর্কে উৎসাহ।

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এসে শিক্ষা নিয়ে ব্যাবসা প্রায় ধনতান্ত্রিক সপ্রতিভতায় উত্তীর্ণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছেই অবস্থিত এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলার ও মাসটার ডিগ্রীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য 'সর্বতোভাবে' সাহায্য করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এঁরা সমান পারদর্শী। প্রতিটি পরীক্ষার জন্যই মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দাবি করা হয়। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কাছে ছাপানো সিফলেটে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় এবং পারিশ্রমিকের মূল্যমান মুদ্রিত থাকে। এদের সাহস দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ এটাই এই পচাগলা সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃতি দিলেই এইসব প্রতিষ্ঠানের পরিধির ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে: 'প্রাইভেটে পাশ করুন। M.A., M.Sc., M.Com., B.A., B.Sc., B.Com., Spl. B.A., H.S., Madhyamik নোটস্ সাজেসনসও কোচিং-এর ব্যবস্থা আছে। রেগুলার পরীক্ষার্থীরা নিশ্চিত সাফল্যের জন্য আজই আসুন, L.L.B./Joint Entrance, Spoken Eng. এবং বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা।' এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানার আগে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের খুব কাছে একটি ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। মালিক দক্ষিণ-ভারতীয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত কলকাতার নামকরা ইংরাজি-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে পড়ে। শুনতে খারাপ লাগলেও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই লিখছি যে, ওইসব ছাত্রছাত্রীর অধিকাংশই বড়লোকের বখে-যাওয়া ছেলেমেয়ে। এদের জন্য ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষিণ ভারতের একটি বিশেষ রাজ্যের স্কুল লীভিং পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা

হয়। সঙ্গে থাকে কয়েক মাসের কোচিংএর ব্যবস্থা। প্রায় পিকনিক উদ্দীপনা নিয়ে ছেলেমেয়েরা দক্ষিণের ওই রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসে। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। পুরো ব্যাপারটার জন্য ওই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রায় হাজার ছয়েক টাকা দাবি করেন। এ ব্যাবসা আজও অব্যাহত। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ওই দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোকের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির হার যে স্তরে পৌঁছেছে তা দেখে যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরও ঈর্ষা হতে পারে।

তিন

কোচিং টিউটোরিয়াল হোম এবং অন্যান্য বেসরকারি ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাকে আরো দীর্ঘ করে লাভ নেই। স্বাধীনতার দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরেও এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ শুধু যে শ্লথ হয়ে আছে তাই নয়, নানারকম সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ এবং ধনতন্ত্রের বহুবিধ পাপ ভারতবর্ষের মাটিতে এক অশুভ সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে ক্রমগত জন্ম দিয়ে চলেছে বিভিন্ন বিকৃতির। জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার' নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর দিকে ধাবমান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। যে দেশে ভূপালের মতো ঘটনা ঘটে, যে রাষ্ট্রে বেবি ফুড, রক্ত এবং জীবনদায়ী ওষুধ নিয়ে কালোবাজারি হয়, সেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং বিকৃতি যে অকটোপাসের মতো জড়িয়ে রাখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গত ছমাস ধরে মহানগরী কলকাতা এবং সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি টিউটোরিয়াল হোম এবং কোচিং-প্রসঙ্গ নিয়ে। বিস্মিত হয়ে দেখেছি, ব্যাপারটাকে অনেকেই সংকট বা সমস্যা বলে মনে করেন না। বিপরীতধর্মী মনোভাব যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে তা নেহাতই অল্প। শিক্ষা-ব্যবস্থার এই অশুভ অঙ্গনকে একজন অধ্যাপক অত্যন্ত সংগত কারণেই চিহ্নিত করেছেন 'underworld of our education system' হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে সৎ নিরীহ বলে প্রতিভাত হলেও অধিকাংশ কোচিং এবং টিউটোরিয়াল হোমের সাফল্যের প্রতিটি ধারাই লোভ, দুর্নীতি এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের মিশ্রণে তৈরি। কলকাতার এক নামকরা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বলেন : 'ছাত্রছাত্রীরা আজকাল কলেজ বা ইউনিভারসিটির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এই-সব কোচিং সেনটারকে। খুব কম সময় ব্যয় করে, এদের দেওয়া নোটস আর সাজেসশনের সাহায্যে, রেজাল্ট ভালো করা যায় বলেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বাস।' অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ওই অধ্যাপকই স্বীকার করেন, কলকাতা শহরের কলেজ বা ইউনিভারসিটির বহু অধ্যাপকই এই ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। 'শিক্ষকই জাতির মেরুদণ্ড' প্রবাদটিকে অনেকেই আজ প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে করেন। প্রসঙ্গটি উঠতেই বহু শিক্ষাব্রতীকে কৌতুক বোধ করতে দেখেছি। এই সর্বগ্রাসী ব্যাবসার সঙ্গে শিক্ষকদের সংযোগ কোন্ স্তরে পৌঁছেছে তা নিয়ে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। অথচ আশ্চর্য, শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনো সেমিনার বা আলোচনাসভাতেই এইসব অধ্যাপক বা শিক্ষাব্রতীর কণ্ঠ থেকে অবলীলায় নিঃসৃত হয় রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রামমোহন, এমনকি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের মতো শব্দমালা। আজকের শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্ছি বুরজোয়া শ্রেণীর এঁরাই ধারক আর বাহক। এই শ্রেণীর অর্থলোভী শিক্ষকের সংখ্যা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এঁদের দিকে ইঙ্গিত করেই পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য বললেন : 'দুঃখের বিষয়, অল্পসংখ্যক স্বার্থান্বেষী শিক্ষকের জন্য গোটা শিক্ষকসমাজ নিন্দিত হচ্ছেন।' সংখ্যাটি সত্যিই অল্প কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু অধ্যাপক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অপর

একটি মন্তব্যের সঙ্গে এই প্রতিবেদক সম্পূর্ণ একমত : 'সামাজিক বিকৃতি এবং বিকৃতির ডিমানড থেকেই এই ধরনের কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের জন্ম।' এই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মতে শিক্ষাক্ষেত্রের 'আনডার-ওয়র্লডের' বাহু শুধু নীচে নয়, বহু উপরেও বিস্তৃত।' '...এটাই তো স্বাভাবিক। যে-কোন আনডারওয়র্লডই উপরতলার কায়েমি স্বার্থের প্রশ্রয়েই লালিত হয়। এক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে—এরকম ভাবার কোনো কারন নেই।' মন্তব্য করলেন একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। কলকাতার বাসিন্দা এবং মফসসল-কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এই ভদ্রলোক শিক্ষাক্ষেত্রের ক্রম-বর্ধমান সংকট সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। ওঁর ভাষায় : 'শহুরে মধ্যবিত্ত এবং গ্রামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। গ্রামে মধ্যবিত্তের হাতে প্রায় সবক্ষেত্রেই কিছু জমি বা ওই ধরনের সম্পত্তি থাকে। শহরে এটা কম। স্বভাবতই শহুরে মধ্যবিত্তের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তাবোধ অনেক বেশি। সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে এরা যে আজ এত বেশি উদ্‌গ্রীব তার কারণও কিছুটা এই অনিশ্চয়তাবোধ। ছেলেমেয়েদের সাফল্যের আশায় কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমের সাহায্য এই অংশই সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে।' বস্তুত ভারতীয় শহুরে মধ্যবিত্তের শ্রেণীচেতনা আজ মারাত্মকভাবে ধনতান্ত্রিক আবেশে আপ্লুত। অবাধ ব্যাবসা, তীব্র প্রতিযোগিতা, নিজ-নিজ শ্রেণী-অবস্থানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরো বেশি সুস্থিত করে তোলার তাগিদে উন্মত্ত এই বিশেষ শ্রেণীটি আজ অন্যকিছু বিশেষ ভাবতে পারেন না। অন্যদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং ভয়াবহ বেকার-সমস্যার নাগপাশে আবদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলিও আজ স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু অসুস্থ মূল্যবোধ গ্রহণ করে নিয়েছে। এই অশুভ মূল্যবোধই তাকে প্রবৃত্ত করছে শিক্ষা এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু অসম প্রতিযোগিতার প্রতি প্রলুব্ধ হতে। ভারতবর্ষের শহর অঞ্চলের এইসব লক্ষ-লক্ষ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়েই শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছেন এক বিরাট দুষ্টচক্র। অর্থ-নীতির জনৈক অধ্যাপক পরিহাস করে বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরাই ওদের কাছে "বাজার"।'

বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এইসব টিউটোরিয়াল হোমের জন্মের জন্য পাঠক্রমকে দায়ী করেন। ব্যাপারটা যে একেবারেই অমূলক, তা নয়। দক্ষিণ কলকাতার একটি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শ্রী উদয় বন্দোপাধ্যায় মনে করেন, 'আজকাল যে পাঠক্রমকে সামনে রেখে পড়ানো হয় তাতে এ ধরনের কোচিং সেনটারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটা বিশেষজ্ঞের যুগ। কোচিং-এ গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বহু বিষয়েই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য পায়। বাড়িতে টিউটর রাখতে গেলে যে খরচ পড়ে তা অনেকেরই সামর্থ্যের বাইরে।' উদয়বাবুর অপর একটি মন্তব্য এ আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। এই ধরনের কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোম-এর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'কোচিং ও টিউটোরিয়াল হোমগুলিকে উঠিয়ে দিলে শহরাঞ্চলের একটা বিরাট-সংখ্যক ছেলেমেয়ের রেজাল্ট অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে।' সন্দেহ নেই, এই সত্যভাষণ থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার মূল প্রবাহের অপদার্থতার চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

আলোচনার এই বিন্দুতে এসেই একটা অপ্রীতিকর এবং দুঃখজনক সত্যের মুখোমুখি হই আমরা। তা হল : শিক্ষা নিয়ে এইঘৃণ্য ব্যাবসার প্রধান সাহায্যকারী শক্তি আজ শিক্ষকসমাজ। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামাঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে এই ব্যাবসা ছড়ায় নি। কিন্তু ছোটো-বড়ো সব শহরেই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে কোচিং বা টিউটোরিয়াল হোমগুলি অর্থ উপার্জনের লোভনীয় যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। ঠিক এই

কারণেই 'ক্লাসরুম টীচিং-এর মান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিলেবাস শেষ করা হয় না। নানারকম কারণ দেখানো হয় এসব ক্ষেত্রে। যথা—সময় কম, শিক্ষকের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত বেশি, দীর্ঘ সিলেবাস ইত্যাদি। এগুলি যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা নয়; কিন্তু কোচিং সেনটারের স্রষ্টারা এইসব সমস্যাগুলিকেই সুকৌশলে তাদের ব্যাবসাকে সাধারণের কাছে যুক্তি-গ্রাহ্য করে তোলার অজুহাত হিসেবে উপস্থিত করেন। সন্দেহ নেই শিক্ষকসমাজও আজ মূল্যবোধের সংকটে আক্রান্ত। অন্যান্য পেশার মতো শিক্ষকতাও এই মুহূর্তে তার যাবতীয় সততা এবং সামাজিক অঙ্গীকার (সোস্যাল কমিটমেনট) থেকে সহস্র যোজন দূরে।

এই অনুচ্ছেদ শেষ করার আগে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর কথা মনে পড়ছে। কোচিং এবং টিউটোরিয়াল হোম সম্পর্কিত আলোচনায় বসে ওই সপ্রতিভ ছাত্রটি পরিহাস করে বললেন, 'আগে ভাবতাম ডাকতার বা ইনজিনিয়ার হব। এখন দেখছি শিক্ষকতাই সবচেয়ে লোভনীয় জীবিকা—অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে। তাহলে গাছেরও খাওয়া যাবে, তলারও কুড়ানো যাবে। স্কুল বা কলেজের মাইনে ব্যাঙ্কে জমবে আর কোচিং-এর পয়সায় বজায় রাখা যাবে স্ট্যাটাস।'

চার

নিবন্ধের তিন-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হল শিক্ষা নিয়ে ব্যাবসার আলোচনায়। এবার প্রসঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুকে সরিয়ে আনা যাক মূল কাঠামোর দিকে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে এই চরম দুর্নীতির আত্মপ্রকাশ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। সমীক্ষায় আমরা যেসব অভিমতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেগুলির প্রতি যথেষ্ট আস্থা রেখেও বলা যায়, মূল শিক্ষা-কাঠামোর প্রতিটি বিভাগই আজ রোগগ্রস্ত। শিক্ষাদান, সিলেবাস, পরীক্ষাপদ্ধতি এবং সর্বোপরি শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য—সব-কিছুই দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসম পরিকাঠামোর শিকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র প্রাদেশিকতা বা শোভিনিজম, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি, ধর্মের ক্ষেত্রে ঘৃণ্য মৌলবাদ যে দেশে স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, সেই জমিতে, সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাছে নির্মল শুচিতা আশা করা দুরাশা মাত্র। এই আলোচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে একটি প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম আমরা। শেষ লগ্নে এসে নতুন করে একই প্রশ্ন বিদ্ধ করছে বিবেক আর চেতনাকে। প্রশ্নটি হল: এদেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বর্তমান মান সম্পর্কিত। এইসব স্বীকৃতপ্রতিষ্ঠান কি সত্যি-সত্যিই হারিয়ে ফেলেছে তাদের যথার্থ গুরুত্বকে? টীকা, টিপ্পনি, তথ্য, পরিসংখ্যান, বিশেষজ্ঞের অভিমত প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে আসুন একটা গল্পের অবতারণা করা যাক—

হ্বাসারকৃফ্ এক মধ্যবয়সী ব্যক্তি। জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত এই মানুষটি একটার পর একটা চাকরি খুইয়ে একেবারেই বিভ্রান্ত। প্রতিটি কর্মস্থল থেকেই সে বিতাড়িত হয়েছে কোনো কিছু না-জানার অভিযোগে। অবশেষে হ্বাসারকৃফ্-এর ধারণা জন্মায়, এই না-জানা বা অজ্ঞতার মূলে তার শিক্ষাই দায়ী। সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও সে আজ প্রকৃত অর্থেই মূর্খ। এর পর এক অদ্ভুত দাবি নিয়ে হ্বাসারকৃফ্ উপস্থিত হয় তার প্রাক্তন স্কুলে; তার বক্তব্য, এই স্কুলের শিক্ষকেরা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন—তাকে কিছুই শেখান নি। এতএব এই মুহূর্তে তার টিউশান ফী ফেরত দেওয়া হোক, সুদসমেত। এর পর শিক্ষকরা হ্বাসারকৃফ্-এর নতুন করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে এক বিচিত্র প্রহসন। প্রাক্তন ছাত্রের চরম দুর্বিনীত আচরণকেও শিক্ষকরা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা বলে চিহ্নিত করেন নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে। তার প্রতিটি ভুল উত্তরকেই সঠিক বলে ঘোষণা করেন তাঁরা। এভাবেই শেষ পর্যন্ত তাকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যথায় হ্বাসারকৃফ্-এর ব্যর্থতা, এইসব শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্যবস্থার অস্তিত্বকেই চ্যালেনজ জানাতে পারে। এ কাহিনী এই প্রতিবেদকের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত "রিফানড" নাটকের সংক্ষিপ্তসার। আলোচ্য নিবন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীটি খুবই তাৎপর্যময়, বিশেষ করে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের ক্ষেত্রে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো অর্থাৎ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতি বছরই হাজার-হাজার হ্বাসারকৃফ্-এর জন্ম দিচ্ছে যাদের ভবিষ্যৎ অপরিমেয় শীতলতা আর নিরেট অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেছে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আজ সার্টিফিকেট পাবার প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়, আর কোচিং টিউটোরিয়াল হোম এবং করসপনডেনস কলেজগুলি হল এই সার্টিফিকেট, ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পাইয়ে দেবার এজেনট। ব্যক্তিক্রমী দৃষ্টান্ত টেনে অনেকেই বিষয়টিকে ঘোলাটে করে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে মূল চিত্রের বিশেষ কোনো তারতম্য ঘটবে না। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। জীবনযুদ্ধের প্রতিটি আঙিনায় পরাজিত হয়ে, এক সর্বাত্মক ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে এইসব লক্ষ-লক্ষ হ্বাসারকৃফ্রাই একদিন ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। শুধু 'শিক্ষা' নয়, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রই আক্রান্ত হতে পারে এদের ব্যর্থতা, ক্ষোভ এবং গ্লানি থেকে জন্ম নেওয়া আক্রোশের শিখায়। একটি আধুনিক কবিতার লাইন সেদিন এদের কাছে যুদ্ধের শ্লোগান হয়ে উঠতে পারে—'আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ তবে কে বাঁচাবে।' —তখন ??

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল : অদ্ভুতুড়ে ভাষ্য ?

সরোজকুমার সান্যাল

মৃত্যুর কদিন আগেই সুকুমার রায় (জন্ম ১০ অকটোবর ১৮৮৭, মৃত্যু ১০ সেপটেমবর ১৯২৩) বুঝেছিলেন, 'ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর/গানের পালা সাঙ্গ মোর।' কোন্‌-সেচান্দ্রশৈত্যের গাঢ় হিম যে তাঁর মনুষ্যজীবনকে 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' মনে করিয়েছিল তা অবোধ্য। শয্যাশায়ী অবস্থায় দীর্ঘকাল তিনি কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসুস্থতার সময়ও তাঁর কাজের নৈপুণ্য আর ব্যস্ততা কোনো অন্তঃসারহীন ঘোড়ার ডিমের কথা মনে করায় না। অথচ মানুষ এতই অন্তরঙ্গ যে, এই বিষাদের ছায়াপাতের কারণ খুঁজে বের করা সুকঠিন। স্মর্তব্য যে, এই মৃত্যু দীর্ঘদিনের ব্যাধির পীড়নে। কিন্তু এর আগের পংক্তিটি 'দস্যি ছেলে সুকুমারের' কথাই বলে—'দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।'

ছন্দের ব্যাকরণ তাঁর ছিল করতলধৃত আমলকের মতো। ব্যাকরণ না মেনে (?) ('পোর্টোম্যান্টু' শব্দ) যেসব হাঁসজারু, বকচ্ছপ, গিরগিটিয়া, হাতিমি তাঁর সৃষ্টি (আবিষ্কার ?), তারা আজকের আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে। মুখ আর মনের বৈপরীত্য, কথা/প্রতিশ্রুতি আর কাজের পার্থক্য কি আজ বেড়ে যায় নি ? 'ধড়ে মুড়ো সন্ধি' ঘটে নি ?

ক্লাবের নাম দিয়েছিলেন 'ননসেনস'। কিন্তু এই 'মাণ্ডে ক্লাবের' বা 'মণ্ডা সম্মেলনের' কাব্যপ্রবন্ধাদি পাঠ (এবং যেসব স্বনামখ্যাত গুণিজনেরা ছিলেন এর সভ্য) প্রমাণ করে, আলোচ্য বিষয়গুলো কদাচিৎ-ই অর্থহীন ছিল।

অর্থহীন ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে এই 'ননসেনস ক্লাব' কখনোই স্তব্ধ ছিল না। প্রায় প্রতিটি ছড়ায় পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর শেষাংশের বর্তমানকেও। আমাদের সমাজের নানা ধরনের খেয়ালি, বে-খেয়ালি আর বদ-খেয়ালি বিবিধ রকমের মানুষ কখনও অদ্ভুতুড়ে জন্তু হয়ে তাঁর ছড়ায় এসেছে। সব ছড়া/কবিতায়ই তারা উপস্থিত এমন বলা বোধকরি ঠিক নয়। বিশ্লেষণে দেখি, সুকুমারের "আবোল-তাবোল"-এ

একবিংশ শতাব্দীর মানুষও হাজির। তৎকালীন অনেকে উপস্থিত তো বটেই।

আগেই বলেছি, ছন্দের ব্যাকরণ ছিল তাঁর হস্তামলক। 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'সিংহরিণ', 'গিরগিটিয়া', 'জিড়িং', 'গোরগ', 'হাতিমি'দের শেষ পর্যন্ত মুড়ো এবং ধড়ে সন্ধি হয় না। মুড়ো এক কথা বলে তো ধড় আর-এক কাজ করে বসে। আমরা এমন অনেককেই জানি যাদের কথা এবং কাজে প্রবল ব্যবধান। অনেকের অতীতচারিতার মন বলে বসে—'আমাদের সময় এমন ছিল না।' এই 'নসট্যালজিয়া' বার্ধক্যের গুরুভারে তথ্যের বিকৃতায়ন মাত্র। ছাত্র-প্রাণ শিক্ষকসমাজের সর্বস্তরের মানুষের মঙ্গল আর উন্নয়নের জন্য দেশসেবা—এসব সুকুমারের কালে ছিল না, এখনো নেই বললেই চলে।

"আবোল তাবোল"-জাতীয় রচনার ঋদ্ধি আর সিদ্ধির নির্ভর মূলত যে দুটির উপর—প্রগাঢ় সমাজ-চেতনা এবং প্রখর বুদ্ধিদৃপ্ত নির্ভার কিন্তু দীপ্ত কৌতুক, তাতে সুকুমার ছিলেন নিতান্তই সিদ্ধকাম, অথচ হালকা কুয়াশায় অস্ফুটবাক্‌। ব্যক্তিকে আঘাত করার শ্লেষ সেখানে অনুপস্থিত। এ ধরনের বিশ্লেষণ বিদ্বানদের মনঃপূত না-ই হতে পারে—কিন্তু সাহিত্য-বোদ্ধাদের কাছে সনির্বন্ধ নিবেদন—এমন করে ভাবাটা কি অত্যন্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা অস্থানজল্পন মাত্র ?

হেড অফিসের শান্ত বড়বাবু তাঁর গোঁফ চুরি গিয়েছে ভেবে সারসত্য বুঝে ফেলেন, 'কাউকে বেশী লাই দিতে নেই সবাই চড়ে মাথায়।' আয়নাতে নিজের নোংরা ছাঁটা বিচ্ছিরি, ময়লা, থ্যাংরা ঝাঁটার মতো গোঁফ দেখে উপলব্ধি করেন যে, 'বড়বাবুদের' কি এমন খারাপ গোঁফ থাকে, না থাকতে আছে ? —তাই 'ছোটোলোক' শ্যামবাবুদের 'গয়লা' 'ট্রান্‌ফারড্‌ এপিথেটে' ওইরকম গোঁফের মালিক হবার যোগ্য হল। তোমার (বড়বাবু নও) এবং আমার (বড়বাবু) গোঁফ দিয়েই মর্যাদা বা কৌলীন্যের পার্থক্য বুঝতে পারা যায়—ছোটো-কেরানির দল, ছাপোষা গরিবের দল যে নেহাতই মুর্খ, তা 'বড়বাবু'রা ছাড়া আর বুঝবেন কারা ?

মেয়ের বিয়ে নিয়ে মা-বাবা আর গুরুজনরা এখনও চিন্তায় থাকেন। একে তো বিয়ে দেওয়াটাই সমস্যা (কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো দেখুন—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, রন্ধনে দ্রৌপদী, বাক্‌-বিন্যাসে আই. এ. এস-নী—এ ধরনের পাত্রীই বরপক্ষ বেশি করে চান), তারপর এবং তবুও 'বউকাঁটকী' শাশুড়ি-ননদ, গুণধর জামাই—এদের সহযোগিতায় বা একা-একাই বধূ-নির্যাতনের পারঙ্গমতা দেখায়। এসব খবর হামেশাই প্রকাশিত হয়। মেয়ের বিয়ের জন্যে বাবা সৎপাত্র খুঁজে পেয়েছেন জেনে (সম্ভবত অন্য মেয়ের বাপ, হিতৈষী বা হিংসুক, বন্ধু অথবা ভাংচিদেনে-ওয়ালা) পাত্র গঙ্গারামের আত্মীয়-স্বজনের খবর দিতে গিয়ে যখন বলেন, 'কিন্তু তারা উচ্চঘর,/কংসরাজের বংশধর।' তখন 'কংসে'-র অনুষঙ্গে যে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে পাত্রপক্ষ দেখা দেয়, কন্যাপক্ষ তো তখন চোখে অন্ধকার দেখেন। উচ্চঘরেই তো বধূনির্যাতন আর বধূহত্যা বেশি ঘটে—অন্তত আজকের দিনে। সুকুমারের এসব ছড়া/কবিতা কি নিতান্তই অর্থহীন, এই শতবর্ষ পরেও যার বাস্তবতা অনস্বীকার্য ?

যে রোগের যে দাওয়াই। ভীষ্মলোচন শর্মাকে 'সবাই হাঁকে, আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী'। এবংবিধ ওস্তাদ গাইয়েকে 'দাদা' 'লক্ষ্মী'—এসব ভালো কথায় ঠিক করা যায় না, যেমন যায় না তাবড়ো-তাবড়ো বক্তাকে থামানো। 'এবার থামুন', 'ছোটো করুন', 'শেষ করুন',—এত সব স্লিপ পাঠালেও অনেক ওস্তাদ থামতে জানেন না। তখন শব্দনিয়ন্ত্রক নানাভাবে ওস্তাদ বক্তাকে থামান। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই অর্থেই না বললেও 'ওরে ভাই ওস্তাদ গাইয়ে,/আমার বাড়ির থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে' -জাতীয় লেখা লিখেছেন। কিন্তু দাওয়াইটা সুকুমারের মাথায় আর লেখায় খুলেছে ভালো—

এক যে ছিল পাগ্‌লা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপরে' ব'লে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

এইসব কালোয়াত অকেজো বক্তার দলকে বড়ো বেশি দেখা যায়। আজকাল বড্ডো বেশি করে।

সুকুমারের ছড়া/কবিতা "শব্দকল্পদ্রুম্!" বিখ্যাত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" নয়। নিরীহ শব্দসম্ভার দিয়ে এমন কৌতুক মনে রাখার মতো। সব শব্দের অর্থ পাওয়া যাবে—শব্দার্থের কল্পতরুর নাম দিয়ে ছড়াটিতে যেন দুরমুশ ঠোকার হুড়ুম্-হুড়ুম্ আওয়াজ এবং শব্দের ব্যবহারের রদবদলের ফলে অর্থান্তর এনে যে উইট আনার প্রয়াস, তা-ও স্পষ্ট। ব্যবহৃত শব্দ/শব্দগুলির অর্থান্বয় তিনি যেভাবে ও যেসব বিষয়ে করেছেন তাতে কৌতুকের বর্ণচ্ছটা লক্ষণীয়, উপভোগ্যতায় অম্লান।

বছরখানেক বয়সে 'গুংগা'-বলে-চেঁচানো-চণ্ডীদাসের-খুড়ো পরে বুদ্ধিজোরে এক ত্বরিতে কার্য-নিষ্পন্ন করার ফল তৈরি করেছেন। লোভনীয় খাবার-দাবার ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে ঝুলিয়ে 'এই পাব, এই পাচ্ছি—এই তো পেয়ে গেলাম' ব্রিটিশরাজ করেছেন—স্বরাজ এই তো দেব, একটু সবুর—এই স্বায়ত্তশাসন তো মিলল—এবারে স্বরাজ তো পাবই—এসব আশা করিব জীবদ্দশায় ব্রিটিশ কর্তারা আমাদের দেশের অনেক নেতাকেই দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাসও করেছেন এবং অবশেষে ঘুরিয়ে মেরে একটা ভাঙা ভারত দিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করেছেন। তেমনি এখন আবার প্রতিশ্রুতির বাহারে থলে সামনে ঝুলিয়ে ছুটিয়ে মারার চেষ্টা হচ্ছে বেকারদের, দেশের অর্থনীতির চাঙ্গায়নী সুধার অসত্য কথা বলে আমরা, যারা বিশেষ রাজনীতি ও বিশ্ব-রাজনীতির খোঁজ জানি নে তাদের সামনে 'খুড়োর কল'টা বসানো হয়েছে—এঁরা ভেবেই রেখেছেন যে 'উৎসাহেতে হুঁস রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।' স্বীকার্য, এখনকার চণ্ডীদাসের খুড়োরা 'চালাক-বোকা'—তাই সুকুমারের লেখার সময়ে যে চণ্ডীদাসের খুড়ো ভবে অতুল কীর্তি রাখল ভাবা গিয়েছিল, এখন গণ-আন্দোলনের জোয়ারে এবং বিবিধ পত্রপত্রিকার কল্যাণে অতুল-কীর্তি না ভেবে এই খুড়ে/খুড়োদের সিম্প্‌লটন এবং হোক্‌স্-দান-বিশারদ বলে পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রভক্ত সুকুমার কি রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-উন্মাদনার প্রতি ভিন্নমত এবং সে মতে তৎকালীন বিমুখ নেতাদের প্রতি অনীহা, শিক্ষার সর্বাধিক এবং সর্বতোভাবে বিস্তারে উৎসাহের প্রতি তাঁর সমর্থনই নিতান্ত প্রচ্ছন্ন-ভাবে জানাতে চেয়েছেন? এবং 'খুড়োর কল' কি প্রতিশ্রুতি এবং কার্যে তার একান্ত অনুপস্থিতির দ্যোতক? হোক্‌স্ দেওয়ারই কি অন্য নাম 'খুড়োর কল'? এমনি খুড়ো এবং খুড়োদের আমরা আপন-অভিজ্ঞতায় হামেশাই দেখে যাচ্ছি—ছবিতে, দূরদর্শনে, বেতার-ভাষণে!

নির্বিষ ও নখদন্তহীন বিরোধীকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে বীর হিসেবে নাম কিনতে চাওয়া লোকরাই কি ডাকেন বাবুরাম সাপুড়েদের? 'দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত, নরমের যম'—এই শাশ্বত কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে নি। এখনও তো আমরা ওপরওয়ালার (বড়বাবু বা 'বস'-এর) ধমক খেয়ে বাড়ি ফিরে নিমকের ধমক কাচ্চা-বাচ্চা-গিন্নিদের উপর চালান করি। জমা ক্ষোভ স্বস্থানে প্রকাশ না পেয়ে পায় অস্থানে।

বিমূর্ত বা অস্পষ্ট কোনো ধারণা নিয়ে বিতর্ক করা আমাদের স্বভাবে বর্তেছে। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করি, ভীষণ (!) ভাবে জয়ী হই। আরো আজগুবি ছায়ার মতো 'অধরা-মাধুরীকে' শিশিবদ্ধ করে জ্ঞানভাণ্ডারে জমা রেখে জিজ্ঞাসুদের কম দামে বিক্রি করি! "ছায়াবাজি" সুকুমারের কৌতুক-মাত্র তো নয়—তথা-কথিত দার্শনিকদের আজগুবি চিন্তার তত্ত্ববিন্যাস এবং বিমূর্তায়ন। এখনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্ভারী চাল ভাববাদী আড়ম্বরের জগৎটাকে বেশ খানিকটা স্থিত রেখেছে। 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল'—এসব তর্ক এখনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় (এবং পাশ্চাত্ত্য) দর্শনের অনেকখানি জুড়ে। এই তো ছায়াবাজি,—এবং এ-ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গা-মাথা-ব্যথা করার মতো পণ্ডিতের অভাব নেই। বুঝিয়ে বলার মধ্যে এটা স্পষ্টতর।

"বুঝিয়ে বলা"র মধ্যে রয়েছে 'সবজান্‌তা'দের প্রতি ব্যঙ্গ-কৌতুক-শ্লেষ এবং সুকুমারের কাছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত এই ধরনের লোকেদের প্রতি তীব্র অনীহা। ভাববাদী দর্শনবিলাসীরা এখনো এইসব অযথা বাক্-বিস্তারে অসচেতন মানুষকে কিছুটা প্রভাবিত করেন। এই বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। লোকে যখন বোঝে না, এসব অ-পার্থিব এবং অবাস্তব কথার মানেই বা কী এবং মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা-মানুষদের এতে কী-ই বা লভ্য, তখন মাথা-ঘামানো পণ্ডিতরা রাগ করে বলেই বসেন, 'বুঝতে গেলে মগজ লাগে, বলেছিলাম তখুনি'—। মাথা ঘামাতে হয়, তবে 'উপলব্ধি' ঘটে, নইলে ভাববাদী অনিবার্য জগতের স্বরূপের বোধিলাভ ঘটে না। বেচারা শ্যামাদাসরা এ ক্ষেত্রে পালাতেই চাইবে, এটা একান্তই বাস্তব।

শিবঠাকুরের আপন দেশ (কৈলাস—কই লাশ?) পরাধীন এবং অধুনা-স্বাধীন ভারতবর্ষ কি? ভারতীয় সংবিধানের বপু ও বহুধা সংশোধন-সংযোজন একে যে কলেবর দিয়েছে তার কথা মনে পড়ে। এসমা, নাসা এবং সর্বোপরি জরুরি অবস্থায় যেসব কাণ্ড হয়েছিল তাতে এ-দেশকেই তো শিবঠাকুরের আপন দেশ (জনগণের নয়) বলে মনে হয়। সেখানের 'একুশ' এখানে অনির্দিষ্ট। কবির 'একুশ' ঠিক অঙ্কের 'একুশ' তো নয়।

তবে কি হরবখত মন্ত্রী-বদল, কাউকে কোলে তোলা আবার কাউকে যথাখুশি ঠেলে ফেলার মালিকই বোম্বাগড়ের রাজা? রাজ্যটা, মালুম হয়—এখনকার ভারতবর্ষ। প্রতিভাবান ননসেনস্ ক্লাবের রাজাকে তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রণাম জানাই।

ভ্রমসংশোধন

নভেমবর সংখ্যায় কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। পৃ ৫৭৫, কলম ১, লাইন ৮ : শুদ্ধপাঠ—'জীর্ণ বসন এবং শোবার জন্য বড়ো জোর ছেড়া কাঁথা'। (২) পৃ ৫৯১, কলম ২, লাইন ৫ : শুদ্ধ পাঠ—'একা-একা দ্বীপে'। (৩) পৃ ৬০১, কলম ১, লাইন ১৩ : শুদ্ধরূপ—'ধাটে'।

বাংলাদেশ : ভিন্ন পর্যায় ভিন্ন তথ্য

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই শুধুমাত্র উনিশ শ একাত্তরের যুদ্ধ নয়। বিস্তৃত এর পটভূমি। গণসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় এর প্রেক্ষিত। উনসত্তরের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাহফুজ উল্লাহর "অভ্যুত্থানের উনসত্তর" সেই অধ্যায়ের একটি দলিল। লেখকের কথায়, 'এই বই উনসত্তরের আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, কিংবা সম্পূর্ণ স্মৃতিকথা নয়। আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে যে ব্যক্তিগত ডাইরি রেখেছি এবং যেসব প্রচারপত্র সংরক্ষণ করেছি, তথ্য হিসাবে সেগুলোই আমার প্রধান উৎস। এ ছাড়াও, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে—তথ্যগত ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য।' উনসত্তরের আন্দোলনের সূচনা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহফুজ উল্লাহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় শরিক। এ ছাড়াও সেই সময়ের পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি-জেনারেল মাহবুব উল্লাহর তিনি ছোটো ভাই। আন্দোলনের পরিচয় বিস্তৃত করার প্রয়াস এই বই "অভ্যুত্থানের উনসত্তর"।

লেখকের মতে, 'বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা নির্মাণে এ-দেশের মানুষ যে চারটি পর্যায় অতিক্রম করেছেন এগারো দফার আন্দোলন তার তৃতীয় পর্যায়। সাতচল্লিশের দেশভাগ-ভাগি, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের পর এগারো দফার আন্দোলনই এই জনপদের জনজীবনকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহস ও শক্তি জোগায়।'

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য আয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান। তা পাকিস্তানের উভয় অংশেই। সূত্রপাত পশ্চিম পাকিস্তানে। লেখকের ভাষায়,'১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে রাওয়ালপিণ্ডির ৭০ জন ছাত্র চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য লাণ্ডিকোটাল থেকে, কয়েক হাজার টাকার সামগ্রী কিনে ফেরার সময় পুলিশ তাদের আটক করে। এই আটকের প্রতিবাদে ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়।' লেখক যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষের পটভূমি বর্ণনা করেন নি, আন্দোলন শুরুর এই কারণ এক ধরনের বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। এই বিভ্রান্তির সূত্রোগ আরো থেকে যায় যখন পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের শুরু দেখাতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনার প্রতিবাদ হিসাবে। এবং নিছকযে ছাত্র গ্রেপ্তারের বিষয়ে আন্দোলন নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত প্রথম ছাত্রসভায় (১৯ নভেম্বর ১৯৬৮) উত্থাপিত দা.বিগুলোর প্রকৃতিতে—প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং ভোটাধিকার, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তব পন্থা গ্রহণ ইত্যাদি। দাবির এই বিস্তৃত পরিধিবজন্য এই আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। লেখকই উল্লেখ করেছেন, ঢাকায় কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সদস্যরা মিছিল বের করেন। ঢাকার সাংবাদিকরা রাজপথে নেমে আসেন। তাঁরা শ্লোগান তুলেছিলেন—পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং সাংবাদিকদের মুক্তি; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; জরুরি অবস্থার প্রত্যাহার। পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন নিছক ছাত্র গ্রেপ্তার নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। মহিলারা মিছিল বের করেন। শ্রমিকরা আন্দোলনে যোগদান করেন। রাওয়ালপিনডি শহরের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো হরতাল হয় ২৬ নভেম্বর। যা থাকা উচিত ছিল বইয়ের প্রথমে, আন্দোলনের প্রেক্ষিত, লেখক রেখে-

অভ্যুত্থানের উনসত্তর—মাহফুজ উল্লাহ। ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩। পঁচিশ টাকা।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে—রফিকুল ইসলাম। ছায়াপথ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬। একশ টাকা।

আমরা স্বাধীন হলাম—কাজী সামসুজ্জামান। মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬। পঁচাত্তর টাকা।

একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়—মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭। পঁচিশ টাকা।

ছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আয়ুব-শাসনের এক দশকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত, চূড়ান্ত দমননীতির প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতির উপর হামলা। অপরদিকে এই আঘাতকে প্রতিহত করার মতো কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জন্য আওয়ামী লীগ বিপর্যস্ত। ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রাম। মুজাফ্‌ফর ন্যাপ এককভাবে আন্দোলনের সূচনা করতে রাজি নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে তখন লক্ষ্য আসন্ন নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা ভাবছিল পঁয়ষট্টি সালের মতো বিরোধী-দলীয় মোরচা গঠনের কথা। কিন্তু নির্বাচনের প্রশ্নেও ভাসানী ন্যাপ আর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ছিল মতপার্থক্য। ভাসানী ন্যাপের মধ্যে সাংগঠনিক বিতর্কে একদলের মতে নির্বাচনে যোগদান উচিত নয়। আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত—এক অংশ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেছে। অপর অংশ নিজেদের শেখ মুজিবের অনুসারী '৬-দফাপন্থী' বলে দাবি করেছে। ৬-দফাপন্থীরা একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও আসন্ন নির্বাচন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি প্রশ্নে ছিল মতবিরোধ। দুটি প্রধান দলের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যে বিতর্ক উঠেছিল তার বিশ্লেষণে আমরা উৎসুক হলেও লেখকের বচনায় তা অনুপস্থিত।

তেমনি আরো একটা প্রসঙ্গে আমাদের অতৃপ্তি থেকে যায়। লেখক বিভিন্ন দল বা মোরচার বিভিন্ন সময়ে পেশ করা দফাওয়ারি কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কথনোই সেগুলোর ব্যাখ্যায় যান নি। কী পরিস্থিতিতে কোন্ নীতির ভিত্তিতে এইসব দফাদাবি ঘোষিত হত, সেটা বিশ্লেষণ করলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে ধরা যায়। একটা উদাহরণ রাখা যেতে পারে। লেখক বলছেন 'আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ, পি. ডি. এম ও জামাতের সমন্বয়ে গঠিত 'ডাক' (গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ)-এর ৮-দফা কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্থান পায়নি বলে পূর্ব বাঙলার জনগণ ৮-দফার পতাকাতলে সমবেত হয় নি। এই কর্মসূচী শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তসহ পূর্ববাঙলার বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীর ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে নি। ন্যাপের ১৪-দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনে রূপরেখা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার অনুপস্থিতির ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়।' পরবর্তী কালে ন্যাপ নভেমবর ৬৮ থেকে যে ১০ দফার ভিত্তিতে দাবি সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী নেয় তাতে অন্তর্গত হয় পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। এবং ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১ ডিসেমবর যে ১৪-দফা কর্মসূচী উত্থাপন করে তার প্রধান দাবি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। উদাহরণ হিসাবে যে দাবিটার প্রথমে অনুপস্থিতিএবং পরে অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গটা উল্লেখ করলাম, সেটাই পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের প্রকৃতিকে গুণগতভাবে বদলে দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন প্রথম দিকে প্রধান দুটি দল এটা রাখে নি এবং পরে কেন রাখল? লেখক আমাদের জিজ্ঞাসা মেটান নি। এরই কাছাকাছি আরেকটি প্রসঙ্গ ধরা যাক। ডিসেমবর ১৯৬৮ সালে লাহোরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ সভায় প্রেসিডেনটের কাছে পেশ করার জন্য যে ৯-দফা দাবি প্রণয়ন করা হয়, তার মধ্যে দুটি দাবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি অর্থনীতিক—'দেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান'। এ দুটি দাবি তো ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগেরও। তাহলে এই দুটি দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তানের উভয় অংশে একই সঙ্গে জঙ্গি আন্দোলন চালানো গেল না কেন? এমনই অসংখ্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমাদের মনে বারবার উঠে এসেছে।

মাহফুজ উল্লাহ তাঁর বইয়ের জায়গায়-জায়গায় নানান মন্তব্য করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি। যেমন, 'ভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রচারণা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটে।' কিভাবে? কিসের ভিত্তিতে? যেমন, ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জুনের ছাত্রদের যে সাংবাদিক সম্মেলনে ১১-দফা দাবি পেশ করা হয় তার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—'শাসনে শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্রজনতা গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই অবস্থায় সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে না।'

যেখানে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ এগিয়ে আসছে না, সেখানে ছাত্রেরা কিভাবে এগিয়ে

আসতে পারল? কেননা প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন তো কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের অংশবিশেষ। অথচ এই দুটো প্রশ্নের উত্তর না পেলে ১১-দফার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। কারণ ১১-দফার কয়েকটি দাবি তৎকালীন আন্দোলনের স্তর অনুযায়ী অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া শ্লোগান। যেমন, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকে দুটি পৃথক ইউনিট হিসাবে গণ্য করে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব।

আমাদের এই বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয় যখন লেখক-উল্লেখিত কয়েকটা ঘটনা পর-পর রাখা যায়। ছাত্রদের ১১-দফা ঘোষিত হওয়ার পর-পরই পেশ করা হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী। ছাত্ররা যখন পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দাবি করে তারা অস্বীকার করে। যে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং অর্থনীতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে খাজনা কর দেওয়া বন্ধ করা হবে, সেই ভাসানীই লাহোরে গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে যে আন্দোলনের চুক্তি করলেন তার দাবিগুলির মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নেই। ১১-দফার গুরুত্ব উপলব্ধির প্রশ্নে এইসব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত থেকে গেছে।

একই রকম ভাবে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন ১১-দফার প্রশ্নে উনসত্তরের আন্দোলনে মুজিব রহমানের ভূমিকা বিশ্লেষণে। ১১-দফার আন্দোলন যখন জোরদার, ১ ফেব্রুয়ারি আযুব আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন। ২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা সামলার অভিযুক্তদের সঙ্গে মুজিবমুক্তি পেলেন। তিনি ১১-দফা দাবি সমর্থন করলেন, কারণ তার মধ্যে ৬-দফার রূপরেখাও রয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারিসর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনা-সভায় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুজিবকে বলা হয় তিনি যদি ১১-দফার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোলটেবিলে যোগদান করেন, তাহলে জনগণ তাঁকে ক্ষমা করবে না। সভায় মুজিব বলেন, 'তিনি সরকার পক্ষের সঙ্গে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে দেশের উভয় অংশের পক্ষ থেকে দেশবাসীর দাবি উত্থাপন করবেন এবং যদি সে দাবি গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক হতে ফিরে দাবি আদায়ের জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবেন। ...তিনি আরো বলেন, বাঙালী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।' সভাশেষে জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ হয়। অবস্থা অনুধাবন করে শেখ মুজিব শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বান সেদিন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে পুনঃপ্রচারিত হয়। লেখকের ভাষায়, 'অনেকটা মন্ত্রী গভর্নরদের বাণীর মতো।' পর দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য শেখ মুজিব লাহোর যান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানায়। ১০ মার্চের গোলটেবিল বৈঠকে মুজিব ৬-দফা কর্মসূচী রাখেন, ১১-দফা নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল সত্যিকারের ফেডারেল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান। ১০ মার্চ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আওয়ামীলীগ। কারণ দেখিয়েছিলেন মুজিব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিলের দাবির সমর্থনে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে কমিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

পর-পর-ঘটে-যাওয়া এই ঘটনাগুলির উল্লেখ আছে এই বইয়ের কয়েকটি পাতায়। নেই এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যার বিশ্লেষণে ৬-দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে মুজিবের ভূমিকার পরিচয় মেলে। মুজিব প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন ৬-দফা, ১১-দফা নয়। আন্দোলনের জঙ্গি ভাবকে কমিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অথচ তিনি বুঝেছিলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে টিকে থাকা যাবে না। তাই সেই দাবিও তিনি ছেড়ে দিতে পারছিলেন না। এই জটিল টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের রাজনীতিতে নিজেকে একচ্ছত্র নেতৃত্বে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন যে মুজিব তাঁর খণ্ডিত রূপ ধরা যায় এই উনসত্তরের আন্দোলনকে তাঁর ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বের গভীর বিশ্লেষণে যাওয়া হয়তো মাহফুজ উল্লার আয়ত্তে ছিল না তথ্য বা তত্ত্বের অভাবের কারণে। কিন্তু যা তাঁর সাধ্যে ছিল একজন ছাত্রনেতা হিসাবে, তাকেও তিনি অবহেলা করেছেন। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন প্রসঙ্গে তিনি যেসব তথ্য হাজির করেছেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কমিউনিস্ট পার্টির মতদ্বৈধতা ছাত্র ইউ নিয়নে (মেনন গ্রুপে) আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সূচনা করে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নে সিরাজ শিকদার, মাহবুব উল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে তৃতীয় মত বিকশিত হয়। লেখক এই অবধি জানালেন। কিন্তু মতটা কী? লেখক বললেন, ছাত্রলীগ তখনও সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতে পারে নি। বললেন না তাহলে কিভাবে তারা ১১-দফায় শামিল হয়েছিল। আমাদের জানানো হল উনসত্তরের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়ার জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ সময় ছাত্র ইউনিয়নে (মেনন গ্রুপে) আলোচনার সূত্রপাত হয়। তখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অলিখিতভাবে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। আমাদের জানানো হল না, কী হল আলোচনার ফল। এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিরুত্তর রয়ে গেছে এই বই।

"লেখকের কথা"য় মাহফুজ উল্লাহ লিখেছেন, ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে যে সচেতনতা প্রয়োজন, তা থেকেই এ প্রচেষ্টা (অর্থাৎ এই রচনার) সূত্রপাত। কিন্তু ইতিহাস যেখানে শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ হয়ে যায় সেখানে তা ঐতিহাসিক চেতনা জাগতে অক্ষম। মাহফুজ উল্লাহর ব্যর্থতা সেখানে। উনসত্তরের অভ্যুত্থানের প্রথম সারির কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর "অভ্যুত্থানের উনসত্তর" ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারল না।

মাহফুজ উল্লাহ তাঁর বইয়ের প্রথম দিকে লিখেছিলেন বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা নির্মাণে এ দেশের মানুষ চারটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। তৃতীয় পর্যায়, উনসত্তরের গণ আন্দোলনের পরিচয় রয়েছে তাঁর বই "অভ্যুত্থানের উনসত্তর-এ।

চতুর্থ পর্যায়, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের কথা নিয়েই রফিকুল ইসলামের বই "লক্ষ-প্রাণের বিনিময়ে"। রফিকুল ইসলাম ১৯৭০ সনের প্রান্তে ডেপুটেশনে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর) -এর চট্টগ্রামস্থ হেডকোয়ার্টারে অ্যাডজুটেন্ট হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ই.পি.আর বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে রফিকুল বাংলাদেশ বাহিনীর অন্যতম সেকটর কমানডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বই লেখা হয়েছে। লেখকের ভাষায়, 'আমার ডাইরী', আমার সেকটরের যুদ্ধ সংক্রান্ত ডাইরী, যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন গেরিলা-দলের রিপোর্ট—এ সবকিছুই এই গ্রন্থে তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় সব সেকটর কমানডার এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনা করেই এসব সেকটরের যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করি। এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ ব্যাপারে আমাকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ফলত গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু পাকিস্তানি সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই-এর বিস্তৃত বিবরণ। এ বিষয়ে লেখক বইয়ের প্রথমেই একটি অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর অকপট উচ্চারণ এই যে, 'সশস্ত্র তৎপরতার অধিকতর বর্ণনা যেন জনগণের রাজনৈতিকবোধ ও মুখ্য ভূমিকা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে না নেয়। কেবলমাত্র সামরিক ও গেরিলা তৎপরতার আলোকে স্বাধীনতার মর্মকথা অনুধাবন সম্ভব নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামই হল স্বাধীনতাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো সামরিক অভিযান নয়—স্বাধীনতাযুদ্ধ জনগণের। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো বিজয় সূচিত হয় না।' এই অনুভূতি থেকেই রফিকুল লেখেন যে বাংলাদেশ সরকার এক পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রণয়ন করার চেষ্টা করে। প্রকৃত অর্থে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। তাই এই তালিকা প্রণয়ন বাস্তবধর্মী ছিল না। তাঁর এই সামগ্রিক ধারণার বাস্তব প্রতিফলন বইয়ের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। রফিকুল গর্ববোধক নন বলে সব কথা এক জায়গায় গুছিয়ে রাখতে পারেন নি। খুঁজলে দেখা যাবে, জনগণের প্রায় সমস্ত অংশের মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়া বিষয়ে রফিকুল কোনো না কোনো মন্তব্য করেছেন। তার ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় কয়েকটা উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকায় বাঙালি সশস্ত্র ব্যক্তিদের কয়েকটি সুস্পষ্ট দলে ভাগ করেছেন—(১) স্বাধানতা-চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং আক্রান্ত হবার আগেই পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ করার মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি যাদের ছিল। (২) স্বাধীনতা-চেতনায় অনু-

প্রাণিত কিন্তু আক্রমণের ব্যাপারে সজাগ এবং প্রস্তুত ছিল না। চাকরি ও জীবন যখন বিপন্ন তখন যুদ্ধ শুরু করে। (৩) যুদ্ধে অবস্থার বিপাকে পড়ে যোগদান করে, স্বেচ্ছায় নয়। যখন বুঝতে পারে তাদের জীবনের ওপর কিছুটা হুমকির সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু এই পর্যন্ত এর কোনো বিস্তৃত ব্যাখ্যা, যার প্রয়োজন ছিল, তিনি রাখেন নি। আমাদের একই ক্ষোভ হয় যখন জরুরি প্রাসঙ্গিক সব তথ্য তাঁর বইতে পাওয়া যায়। যেমন, (১) খুব কমসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এসেছিল শিল্পশ্রমিকদের ভেতর থেকে। চট্টগ্রাম এলাকার প্রায় একলাখ শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে বড়োজোর একশত লোক চট্টগ্রাম সেক্টরে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল। (২) যুদ্ধে সবচাইতে বেশি সহযোগিতা করেছে কৃষকসমাজ, স্বাধীনতার জন্য তারা ছিল আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ। (৩) যুদ্ধের সময় খুব কমসংখ্যক চিকিৎসক ভারতে গিয়েছিলেন। (৪) শরণার্থী শিবিরে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকের মধ্যেই ট্রেনিং গ্রহণের কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেত। যুদ্ধকালে এক লাখেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা এক ভাগও শরণার্থী শিবিরের লোক ছিল না। (৫) গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ করতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তার চাইতেও কম। বইয়ের বিভিন্ন অংশে উল্লেখিত এইসব তথ্য আমরা যা পর-পর রাখলাম, তার প্রত্যেকটিকে ঘিরেই আমাদের প্রশ্ন, কেন? যার উত্তর দেবার মতো জায়গায় ছিলেন রফিকুল ইসলাম। এই 'কেন' নিছক একটা বুদ্ধিজীবী-সুলভ কৌতূহল থেকে নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত আছে যে-কোনো দেশের আগামী মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা এবং সমস্যা। প্রয়োজনটা সেখানেই।

আবার একজন সেনানায়ক হিসাবে যুদ্ধকালীন অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন রফিকুল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ চলছিল চিরাচরিত পন্থায়। বাংলাদেশ বাহিনীর কলকাতাস্থ সদর দপ্তর রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে। ফলত যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে, যোদ্ধাদের চাহিদা সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন। উপরন্তু গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ছিল ভুলধারণা। অস্ত্র চাইলেই গেরিলা যুদ্ধের কৈফিয়ত দেওয়া হত। ফলে যোদ্ধাদের অস্ত্রের আশ্বাস পরিপূর্ণ হয় নি। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, ভারত সরকার, আমাদের সরকার এবং সামরিক হেডকোয়ার্টার যদি সময়মত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে অসমর্থই হবেন তাহলে সে কথাটা সোজা করে বলে দিলে আমাদের উচ্চাশা ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতে পারত। দুঃখ এই যে যুদ্ধের ৯ মাসে এই সমস্যাটি বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।' একই বিষয়ে অন্য আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ডের মতো কিছু একটা গঠন করেন। রণাঙ্গনের কমাণ্ডারেরা কিন্তু সর্বোচ্চ সামরিক কমানড থেকে কোনো আদেশই পাননি। বস্তুত অভিযান সংক্রান্ত কোনো আদেশই তাঁদের ছিল না। যে-কোনো মূল্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। আমাদের প্রতি এটাই ছিল সেই বিমূর্ত হাই কমাণ্ডের একমাত্র নির্দেশ। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে এই আদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য হয়তো বিলম্বিত করা যায়। কিন্তু প্রাণঘাতী লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছাড়া শত্রুকে দমন করার চিন্তা আকাশকুসুম স্বপ্নমাত্র। কেউ কেউ এ যুক্তি অনুধাবন না করেই খামখেয়ালী ও অসঙ্গত আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আমাদের সৈন্যরা এই অদৃশ্য কমাণ্ডের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এবং এর আসল অস্তিত্ব সম্পর্কেই সকলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।'

ন্যূনতম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করার যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রফিকুল তাঁর বইতে নির্ভয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এই প্রস্তুতিহীন যুদ্ধের দুটো দিক, যোদ্ধা রফিকুল তাও দেখিয়েছেন। একদল প্রস্তুতির বিকল্পে বাইরের শক্তির মদতে যুদ্ধ জিনতে চায়। আরেক দল প্রস্তুতিহীনতাকে কাটিয়ে নিজেদের সামর্থ্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। রফিকুল লিখেছেন, 'কেউ কেউ আশু ভারতীয় হস্তক্ষেপ কামনা করছিলো, আবার কেউ আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ বিশ বছর কিংবা আরো বেশী সময় ধরে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো।' একই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য আরেক জায়গায় রফিকুল একজন স্বাধীনতাযোদ্ধার মানসিকতাকে ধরে রেখেছেন, 'ভারতের আশ্রয় থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে একথা যেন কোনমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।'

"লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে" প্রধানত যুদ্ধের বিবরণ, কিন্তু সেনানায়ক রফিকুলকে ছাপিয়ে মাঝে-মাঝেই স্বাধীনতাযোদ্ধা রফিকুল সামনে উঠে এসেছেন। তাঁকে লিখতে হয়েছে 'প্রাণরক্ষার জন্য যারা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, তারা দেশে ফিরে এলো মুক্তিদাতার অহমিকা নিয়ে। যে সাড়ে ছ কোটি মানুষ দেশের মাটিতে থেকে যুদ্ধে চূড়ান্ত অবদান রাখলো, করলো অচিন্তনীয় আত্মত্যাগ—তাদের সেই মহান ভূমিকাকে অবমূল্যায়নের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চললো। যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়তো কোনো দিনই সম্ভব হতো না—ভারত থেকে ফিরে আসা কিছু সংখ্যক পোষাকী মুক্তিযোদ্ধা সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অবদানকে নির্লজ্জভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালালো।'

যারা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল এবং যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলো, যাদের সম্বন্ধে স্বাধীনতাযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম অভিযোগ রেখেছেন, তাদেরই কর্মকাণ্ডের পরিচয় কাজী সামসুজ্জামানের বই "আমরা স্বাধীন হলাম"। লেখক-পরিচিতিতে আছে কাজী সামসুজ্জামান '১৯৭১ সনে দিনাজপুরে নির্বাচন অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পরবর্তীতে মুজিবনগরে নির্বাচিত সরকারের অধীনে প্রশাসনিক অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সংসদ সচিবালয়ে সহকারী সচিব হিসাবে যোগ দেন।' মূলত একজন আমলার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের নির্ঘণ্ট—"আমরা স্বাধীন হলাম"। তার পরিচয় বইটির পাতায়-পাতায়। মুক্তিযুদ্ধটা লেখকের কাছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম। গণপরিষদ-সদস্য, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, শরণার্থী শিবির দেখাশোনা, ভারতসরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের সাহায্য নেওয়া—এইসব। সমস্ত বিষয়টা যেন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে সরকারি কাজকর্ম। তাঁর জানানোর বিষয়: আমলারা এবং এম. পি. রা সব ভারতে চলে এসেছিল, বিভিন্ন স্তরের আমলাদের লড়াইয়ে যোগদান, শরণার্থী হয়ে আসা হাজার-হাজার কর্মচারী কর্মকর্তাগণের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, বাংলাদেশ থেকে আগত অফিসারদের শরণার্থী শিবিরে কাজ-করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো—এই ধরনের।

এইসব তথ্য মূল্যহীন নয়। অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে আলোকপাত ঘটায়। যেমন, যখন একটা দেশ প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে, যখন দেশের বাইরে অন্য দেশের আর্থিক সাহায্যে কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে, তখনও সেই কাজকর্ম চালানোর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রেণীভাগ রাখা হচ্ছে, মাসোহারার পার্থক্য বজায় রাখা হচ্ছে। ১৮ জুন ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নলিখিত হারে মাসোহারা দেবার আদেশ জারি করেন। (১) সরকারে নিয়োজিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পাবেন যথাক্রমে ৫০০, ৪০০, ৩০০ এবং ১০০ টাকা। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে-সমস্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে বহাল হতে পারেন নি তাঁরা পাবেন যথাক্রমে মাসিক ২৫০ ও ২০০ টাকা। (৩) বাদবাকি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পাবেন তাঁদের মূল বেতনের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব ১৫০ টাকা। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলার সময় এই সুবিধাভোগ ও শ্রেণীভাগই বুঝিয়ে দেয় স্বাধীনতার পর এর চেহারা কেমন দাঁড়াবে।

সুবিধাবাদের আরেকটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের পরিবেশিত তথ্যে। বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি এক প্রতিবেদন, যা বাংলাদেশের অন্তরীণ সরকারের স্বরাষ্টমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছিল। তাতে এইসব উল্লেখ আছে: (১) ছাত্রলীগ নেতারা দেশ উদ্ধারের কাজে অনুপস্থিত; (২) আওয়ামী লীগের কিছু-কিছু এম. এল. এ. এই ব্যাপারে প্রচার চালাচ্ছে যে ছয়দফা অর্জনই ছিল আওয়ামী লীগের মূলদাবি, স্বাধীনতা নয়; (৩) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বর্তমান কোনো আওয়ামী লীগ কর্মীর জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গোপনে কাজ করছে।

লেখক-উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে দেখা যায়, দেশের ভিতরে যখন মানুষ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, দেশের বাইরে তখন আওয়ামী লীগ নেতারা অন্তঃকলহে লিপ্ত। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম বাঙলার বাগডোগরায় সমস্ত গণপরিষদ-সদস্যদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মুজিবনগর সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। অন্তরীণ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর-পরই আওয়ামী লীগ সংগঠনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পারলামেনটারি পার্টির বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা, আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাথে জড়িত মন্ত্রীদের দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক পদত্যাগ ইত্যাদি প্রশ্ন। এম. এল. এ. ও এম. পি. দের মধ্যে কয়েকজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন।

সামসুজ্জামান নেতৃত্বের খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্ক তাঁদের যে মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করে সেই মানসিকতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করেছেন।

একদিকে কয়েকজন এম. এল. এ. এবং এম. পি. এঁরা মুক্তিযুদ্ধ না করে বরং কোনো রকমে কনফেডারেশন বা সমঝোতার মাধ্যমে সংকটের অবসান চাচ্ছিলেন। অন্য দিকে আরেকদল নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বদলে ভারতের সাহায্যে তাড়াতাড়ি জয়লাভ করে বাংলাদেশে ক্ষমতায় বসতে চাইছিলেন। উদাহরণ, গণপরিষদের সদস্যদের বৈঠকে অন্তরীণ সরকারের রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলামের উক্তি, 'বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ভারতে বসে কি করছে তার উপর নির্ভর করছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ভবিষ্যত।'

কী করেছিলেন তাঁরা? সামসুজ্জামানের বইতেও তার পরিচয় রয়েছে। সর্বতোভাবে তাঁরা চেষ্টা করে গেছেন যাতে ভারত এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণের অন্যতম কৈফিয়ত হিসাবে দেখিয়েছিল শরণার্থীদের চাপ। বাংলাদেশের নেতারা সেই চাপ যাতে না কমে তার ব্যবস্থা করেছে। সামসুজ্জামান লিখেছেন, 'শিবিরের কষ্ট, রোগ, শোক ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যদি শরণার্থীরা দেশে ফিরে যায় তবে ভারত সরকারের বোঝা কমে যাবে, তাই প্রত্যেক শরণার্থী শিবিরের ত্রাণকার্য জোরদার করার ব্যবস্থা করা হলো।'

চেষ্টা করা হয়েছে ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করার। ৮ অগস্ট বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেটের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি, 'ইনশাল্লাহ, এই বছরের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাবো।' ভারতের উপর এই সামগ্রিক নির্ভরতার কয়েকটি বিশেষ উদাহরণও পাওয়া যায় এই বইতে। 'বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি ছাত্র লীগ। ছাত্রলীগের নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওবানের অধীনে ছাত্রলীগের ছেলেরা মুজিব বাহিনী নামে দেরাদুন সামরিক একাডেমীতে এবং আসামের হাফলংগে বিশেষ ধরণের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব ছিল দেশের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর মতবাদ ও আদর্শকে টিকিয়ে রাখা।'

এই যে নিজের দেশের স্বাধীনতা নিজেই লড়াই করে অর্জন না করে পরশক্তির সাহায্যে তা লাভ করার বাসনা, এর যে কোনো বিরোধিতা ছিল না তা নয়। লেখক-উদ্ধৃত বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওসমানি ও বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। 'মুক্তিবাহিনী একাই দেশ স্বাধীন করুক এটাই ছিল ওসমানী সাহেবের ইচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর সব হয় না। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, নির্বাচিত সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে বাংলার মানুষ। যেমন করেই হোক্ দেশ স্বাধীন করে দেশে ফিরতে হবে।' তাজুদিন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সব মানুষকেই যদি পাকিস্তানীরা মেরে ফেলে তবে আমাদের বেঁচে থাকার অর্থ কি? কি হবে যুদ্ধ করে? নির্বাচিত সরকার গঠন করেছি তো সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্যই। অনেক দিয়েছি, আর কত রক্ত দিতে পারে বাংলার মানুষ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ঢাকা পৌছতে হবে।'

এই মনোভাবের অংশীদার খুব সম্ভবত লেখক নিজেও। স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নয়, নিরাপদ দূরত্বে আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের মধ্যে থেকে দেখার ত্রুটি রয়ে গেছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতেও। সবকিছুই তাঁর কাছে যেন সমস্যার সমাধান এই জাতীয় ব্যাপার। কোথাও কোনো বিশ্লেষণ নেই। ব্যাখ্যা নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সামসুজ্জামান লিখেছেন, 'অধিকাংশ এলাকার শহর গঞ্জেও পাক সেনারা যথেচ্ছাচার ভাবে কুলি, মজুর, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা বদমায়েস নিয়ে আলবদর রাজকার ও মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।' লেখকের কাছে কুলি, মজুর আর চোর ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েস একই পর্যায়ের। যদি কুলি আর মজুররা স্বাধীনতাযুদ্ধে না যোগ দিয়ে শত্রুপক্ষে চলে যায় তাহলে বিশ্লেষণের প্রয়োজন স্বাধীনতাযুদ্ধ কেন তাদের টানতে পারে নি।

স্বাধীনতা-যুদ্ধ সামসুজ্জামানের কাছে গনতকারের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়। ভারতের "হিন্দুস্তান স্ট্যানডার্ড" পত্রিকার ১৪ই অগসট ৭১ সংখ্যায় এক গনতকারের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করবে। ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে লেখকের 'হৃদয়টা আনন্দে ভরে উঠলো'। স্বাধীনতা সামসুজ্জামানের কাছে অন্তরীণ মন্ত্রিপরিষদের দেশে ফেরা। শেষের পাতায় লিখেছেন, 'দমদম বিমান বন্দরে পৌছেই দেখি ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটা হেলিকপ্টারে মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্যই উঠে পড়েছেন। একটু পরেই তাকিয়ে দেখি ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার আকাশে উঠে গেছে। বয়ে নিয়ে চলেছে সত্যকে—যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে এই ন'মাস ধরে।'

কী সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশিত "একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?" বইটিতে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে দেশ স্বাধীন হল, সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী চেহারা কী দাঁড়াল? মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র বইটির মুখবন্ধে তার বর্ণনা রেখেছে, 'মুক্তিযুদ্ধের সমুদয় চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপদ নীতি ও ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করা হচ্ছে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ষোলো বছর অতিক্রম না করতেই স্বাধীনতার ইতিহাস ও চেতনা নতুন প্রজন্মের নাগরিকরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। এই বিস্মরণ অস্বাভাবিক নয় এ কারণে যে স্বাধীনতার পর যে কয়টি সরকার আমরা পেয়েছি তারা কেউই মুক্তিযুদ্ধচেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে চায়নি। বরং চেয়েছে এই চেতনা গোটা জাতির স্মৃতি থেকে দ্রুত অবলুপ্ত হোক্। যে কারণে…একাত্তরের ঘাতকদের এদেশের রাজনীতিতে বা সরকারের মন্ত্রী সভায় স্থান করে নিতে দেখেও আমরা নিন্দা করি না, প্রতিরোধ গড়ে তুলি না।'

সেই একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, তারই হিসেবনিকেশ নিয়েই এই বইটি। কয়েকটি দল এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরোধিতা, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হত্যা, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশের প্রশাসন, রাজনীতি, সামাজিক জীবনে কোথায় কোথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার বিবরণ রয়েছে এই বইতে। যেমন, বি এন পি ও জাতীয় পার্টি উভয় দলে রয়েছে বাঙালি-হত্যাকারী খুনী দালালরা। জিয়াউর রহমান শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, আলবদরদের নিয়ে দল গঠন করে। একজন মুখ্য দালাল শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যাকারী খুনী সহ বহু দালালকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়। যে অভিযোগ এরশাদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও। একজন স্বাধীনতা-বিরোধী উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন। কিন্তু এসব তো নিছক খবর মাত্র। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। কে কী ছিলেন, কী হয়েছেন সেটা একটা দিক, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কোন্ প্রক্রিয়ায় তাঁরা হলেন। কোন্ সুযোগ তাঁরা তৈরি করছেন তা বোঝা। যেমন ধরা যাক দালালদের শাস্তি দেবার আইন প্রণয়ন প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াটা। এই বইতেই তা ছড়িয়ে আছে। পরপর সাজালে এই রকম দাঁড়ায়।

ক্ষমতা-গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য সদস্যরা হত্যাযজ্ঞকে নজিরবিহীন বর্বরতা বলে উল্লেখ করে এর বিচার করার আশ্বাস দেন। স্বাধীনতা-বিরোধী খুনী দালালদের জনরোষ থেকে বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ১৬ ডিসেম্বর থেকে চেষ্টা শুরু করে। কুখ্যাত দালালদের কাছ থেকে সে সময় আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে আবেদনপত্র জমা পড়েছিল, তাদের জেলখানায় সরিয়ে নেয়ার জন্য। এদের বিচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার কালক্ষেপণ-নীতি গ্রহণ করে। ১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে অস্থায়ী

রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেখ মুজিবর রহমান ১০, ১২, ১৪, জানুয়ারি ; ৬, ২১ ফেব্রুয়ারি; ৩০, ৩১ মার্চ, ২৬ এপ্রিল, ও ৬ মে ১৯৭২ বিভিন্ন জনসভায় ও বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন দালাল আর হত্যাকারীদের বিচার করা হবে, তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জনসভায় তিনি বললেন, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমায় ক্ষমা করবে না। বিভিন্ন মহল থেকে দালালদের বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত আদালতের দাবিকে উপেক্ষা করে জারি করা হয় 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ-ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২'। গণ-হত্যাকারী এবং দালাল নেতাদের সুকৌশলে রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়েছিল এই আইন। কারণ আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছিল থানার ভারপ্রাপ্ত ও. সি. যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারো কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হবে না ট্রাই-বুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা যাবে না। ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন সামরিক সরকার একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে দালাল আইন তুলে নেয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস-নোটে নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন জানাতে বলা হয়। এটা হল সরকারি প্রক্রিয়ার একটা উদাহরণ। পাশাপাশি অন্যান্য চেষ্টাও ছিল। যেমন সরকারি পৃষ্ঠ-পোষকতায় পনেরো খণ্ডে সমাপ্ত স্বাধানতা-যুদ্ধের যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, মূলত দালালদের ভূমিকাকে অত্যন্ত সুকৌশলে চেপে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তা প্রণীত হয়েছে। এ অভিযোগও মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের।

কিন্তু সরকারি ষড়যন্ত্র বা কৌশল একটা প্রয়াস, আর সাধারণ মানুষকে তা মানতে অভ্যস্ত করানো আরেকটি স্তর। এবং তা তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের অভিঘাতটা সেখানেই নামিয়ে আনা প্রয়োজন সামাজিক মূল্যায়নের তাগিদে।

শান্তি কমিটি, আলবদর, আল-শামস প্রভৃতি যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম-বিরোধী সংগঠনগুলো তৈরি হয়েছিল তাদের প্রচারকাজকর্ম, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শান্তি কমিটির মিছিলে প্রধানত দু ধরনের শ্লোগান ছিল ; রাজনীতিক —যেমন, পাক-চীন জিন্দাবাদ, মুসলিম জাহান এক হও, ভারতকে খতম করো ; ধর্মীয়—যেমন, আল্লাতালা মেহেরবান, ধ্বংস করো হিন্দুস্থান। শান্তি কমিটি খুন করেছে সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে, নিহত-দের সম্পত্তি দখল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ, বিকৃত ধর্মীয় উন্মাদনার স্বার্থে। তাদের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ছিল মালি, মেথর, ধোপা, জেলে এবং নাপিত ছাড়া সকল হিন্দুকে উৎখাত করা হোক। পাকিস্তানে আশঙ্কামুক্ত হয়েও আত্মবিশ্বাসের সাথে সকল বৌদ্ধ যাতে বাস করতে পারে সেজন্য তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক। শান্তি কমিটির নেতারা যে কথা বলতেন তার কয়েকটি প্রধান বিষয় হল (১) ভারত পূর্বপাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, (২) দুষ্কৃতিকারীরা (স্বাধীনতা-সংগ্রামী) নকশালপন্থী শক্তিদ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, (৩) মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যি-কারের আজাদী মনে করে, (৪) বাংলা দেশে ইসলাম ও মুসলমানের কোনো জায়গা হতে পারবে না।

আমাদের ভাবতে হবে, এইসব শ্লোগান আর বক্তব্যের কোথাও একটা ধর্মীয় সামাজিক স্বীকৃতি আছে। না হলে কোনো সরকারের পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না শাসনতন্ত্র থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে বাদ দেওয়া, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। সম্ভব হয় না স্বাধীন বাংলা-দেশে জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থান। এইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ ছাড়া নিছক কোন্ দালাল কী করছেন এই সংবাদে কিছু এসে যায় না। যদি আমরা বুঝতে না পারি কিভাবে ধর্মীয় রণোন্মাদনার ভিত্তিতে ১৫ বছরের নীচে শিশু কিশোরদের নিয়ে 'শাহীন ফৌজ' তৈরি করা যায়, তাহলে দালালির পুনর্বাসনের সামাজিক স্বীকৃতিকেও বুঝতে পারব না। বইটাতে সেই প্রয়াস লক্ষিত হয় নি।

বইটাতে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। যেমন, মুজিববাহিনী যুদ্ধরত বহু বাম-পন্থী মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল ; বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার যাঁরা হয়েছেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন ; মুজিব-বাহিনী বুদ্ধিজীবী-হত্যার যে মহাপরিকল্পনা উদ্ধার করেছিল তা প্রকাশ করতে না দিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয় ; এই হত্যা-কাণ্ডের জন্য কোনো সরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নি, বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন, আহ্বায়ক জহির রায়হান হত্যা-কাণ্ডের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে অনেক দূর এগিয়ে যান ; জহির রায়হান রহস্য-জনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। আবার একই কথা বলতে হয় : অন্যায় হয়, অন্যায়ের খবর জানা যায়। কিন্তু এই পর্যন্ত। তারপর সেই অন্যায়ের প্রতি-বাদ যদি না হয়, তার জন্য কোনো সরকার বা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বই লিখে খুব কিছু একটা হয় না। এ স্বীকারোক্তি অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রেরও। 'স্বার্থান্ধ রাজ-নৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি সমাজের প্রতি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দায়িত্বহীনতাও কম দায়ী নয়।'

"শ্রেষ্ঠ কবিতা" সিরিজ

বাঙলা ভাষায় সাম্প্রতিক কালে "শ্রেষ্ঠ কবিতা" সিরিজ প্রকাশ করে 'নাভানা' প্রকাশন সংস্থা (পঞ্চাশের দশকে)। "চতুরঙ্গ"-র অকটোবর সংখ্যায় ৫৩৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে দে'জ পাবলিশিং এই সিরিজের প্রবর্তন করেন। তথ্য হিসেবে এটি ভ্রান্ত। শ্রীরামপুর, হুগলী থেকে শ্রীপ্রদীপ্ত-কুমার মিত্র পত্র লিখে আমাদের অনবধানজনিত এই ভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক

সৌন্দর্যভাবনা

বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব—ড অজিত বন্দোপাধ্যায়। দে বুক স্টোর, কলকাতা। ১৩৯২। বাইশ টাকা।

নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙলায় অ্যাকাডেমিক চর্চার একটা ধারা বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই চর্চায় য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মতামত সংকলন করা রেওয়াজ। বোসাঙ্কের নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস প্রধান ভরসা। বিষয়টিতে প্রবেশের ভূমিকা হিসেবে এ চর্চা খানিকটা কাজে আসে হয়তো, কিন্তু বিদ্যাটি প্রয়োগের জমি খোঁজার উৎসাহ বড়ো একটা দেখা যায় না। কান্ট্, ক্রোচে, কলিংউডের কিছু বুলি রপ্ত হয়; তার সঙ্গে আমাদের বাস্তবতার, আমাদের শিল্পসাহিত্যের বোধের যোগ কী—ভাবা হয় না সচরাচর। কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে এই ধরনের নন্দনতত্ত্ব-চর্চার ব্যবস্থা আছে। ছাত্ররা দেখি বিষয়টি নিয়ে বেদিশে বোধ করেন। অবচ্ছিন্ন এই তত্ত্বচর্চার সঙ্গে মূল পাঠ্যবিষয়ের এবং নিজেদের শিল্পসাহিত্যের অভিজ্ঞতার যোগ খুঁজে পান না।

সমাজবদ্ধ মানুষেরই দর্শন থাকে। দর্শনের থাকে সামাজিক শিকড়। সমাজবদ্ধ মানুষেরই আর-সব বোধ-বিবেচনার মতো সৌন্দর্যের বোধ-বিবেচনা থাকে। তাই মানুষের দর্শনে নন্দনতত্ত্ব এক মূল অঙ্গ। মানুষের সমাজ চলনশীল। মানুষের ধ্যানধারণাও বদলায়, নন্দনবোধও বদলায়। কোনো তত্ত্বই আকাশ থেকে নামে না, সামাজিক মাটি থেকে জন্মায়। এই পরিপ্রেক্ষিত ভুললে তত্ত্বের আলোচনায় পণ্ডিতি ভার জমে।

বাঁধা বুলি না আওড়ে বাঙলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবনার বিকাশ দেখাবেন প্রতিশ্রুতি থাকায় শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইখানি আগ্রহ জাগায়। "সৌন্দর্যতত্ত্ব" বলতে তিনি "থিওরি অব বিউটি" বোঝান, যা নন্দনতত্ত্ব বা "বীক্ষাশাস্ত্রে"র "অন্যতম গণ বা বিভাগ রূপেই ধরা হয়েছে।" তা হোক। শেষ অবধি অবশ্য এই ধরনের বিষয়-বিভাজনের কোনো অর্থ থাকে না। মানুষের আর-সব মূল্যবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক, সাপেক্ষতা-স্বাশ্রয়িতার যাবতীয় বিচার এসেই পড়ে। অজিতবাবুর লেখাতেও এসেছে।

গ্রন্থসমালোচনা

তাতে কিছু আপত্তি করার নেই। কিন্তু বইখানা পড়ে যেতে-যেতে কেবলই মনে হয়—লেখক দোটানায় ভুগছেন। বাঙলায় সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার পুরো একটা তামামি তৈরি করবেন, না, জন-কয়েক বড়ো লেখক ধরে ক্রিটিক্ critique লিখবেন ঠিক করতে পারছেন না। ক্রমাগত তাই লেখার মধ্যে ঝোঁক পালটেছে।

প্রথম ধরনের সমীক্ষার কাজ যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে, গোড়ার "সৌন্দর্য-মূল্যের বৈশিষ্ট্য"—"সংস্কৃত সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্বচিন্তা"—"পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-তত্ত্বালোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"—প্রঞ্চাশ পৃষ্ঠা ধরে এই তিনটি পরিচ্ছেদের অবলোকন অবান্তর। নতুন কথাও কিছু নেই এখানে। নানা মুনির মত সংকলন। এ সংক্ষিপ্তসারটি সামনে রাখার একটাই উদ্দেশ্য। মূল আলোচনায় থেকে-থেকে তুলনা টানা। যেমন, "বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সুন্দরের এই উপাসনা প্রসঙ্গে কাণ্টের প্রদত্ত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা স্মরণে আসা স্বাভাবিক।...অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র যে সাক্ষাৎভাবে কাণ্টের সৌন্দর্যব্যাখ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সৌন্দর্যের উপরোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। সৌন্দর্যকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলার পিছনে তাঁর উপরে ইংরাজ সৌন্দর্য-তাত্ত্বিকদের প্রভাব থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়। বার্কও প্রয়োজনের থেকে..." ইত্যাদি। (পৃ. ৬৬)। আবার, "সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ কারো ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা-নির্ধারণে সৌন্দর্যকে প্রয়োজনের থেকে পরিহার করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।" (পৃ. ৬৭)। এই তুলনার ঘোর কিছুতেই কাটে না। তুলনামূলক রিসার্চে রবীন্দ্রনাথকে লেখক একই সঙ্গে "অতীন্দ্রিয়বাদী" ও "সর্বেশ্বরবাদী" বলেন—কারণ রবীন্দ্রনাথ হামেশা উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। (পৃ. ৯৫-৯৬)। আবার এই রবীন্দ্রনাথকেই লেখকের মনে হয় প্লেটোপন্থী-অ্যারিস্টোটলপন্থী এবং প্লটিনাস-কাণ্ট-শেলিং-বোমগার্টেন-ভিক্টর কুজাঁ প্রভৃতি যাবতীয় য়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্‌দের অধমর্ণ। হাজার আড়াই বছরের ঝাঁক-ঝাঁক দার্শনিকদের যাবতীয় তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ এভাবে হজম করেছিলেন জেনে অভিভূত লাগে! এসব দার্শনিকদের মধ্যে মতবাদগত অবস্থানের ফারাক সম্পর্কে অবহিত থাকার সুযোগ হয় না অজিতবাবুর, সকলকে এক পাকে চড়িয়ে

দেন। অটুট উৎসাহে অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং গৌণ লেখকদের উপরেও একই ধরনে তল্লাশি চালিয়েছেন।

ডক্টর বন্দোপাধ্যায়ের গবেষণার অন্য দিকটির গুরুত্ব মানতে হয়। ৪ থেকে ১৩, ১০টি পরিচ্ছেদে বেশ কিছু নতুন খবর মেলে। খানিকটা কালানুক্রমিক সমীক্ষার ধরনে মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং গৌণত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-অভয়কুমার গুহ (তাঁর বই—'সৌন্দর্যতত্ত্ব, ১৯১৬)-অজিতকুমার চক্রবর্তী-হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-তারাপ্রসন্ন ঘোষ-গোপীনাথ কবিরাজ-সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-যামিনীকান্ত সেনের রচনা ও ভাবনার পরিচয় আছে। পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে যাবতীয় লেখার সমীক্ষা একটি বড়ো মাপের কাজ হতে পারে। অজিতবাবু এ কাজ সম্পন্ন করার যোগ্যতা রাখেন। বইয়ে দেখা যাচ্ছে তিনি 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'-'রহস্য সন্দর্ভ'-'আর্যদর্শন'-'বঙ্গদর্শন'-'বামাবোধিনী' - ভারতী' - 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকা দেখেছেন। কিন্তু পুরো কি দেখেছেন? তাঁর কাজের সময়সীমা ১৯২৫ অবধি। বইয়ে উল্লেখ নেই এমন আরও পত্রিকা প্রকাশিত হত এই সময়ের মধ্যে। একটি পত্রিকাপঞ্জি যদি বইয়ে থাকত, বোঝা যেত কতটা খোঁজ-খবর করেছেন। তবু, যতটা করেছেন সেও কৃতিত্বের কাজ।

'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' পত্রিকার "কায়িক সৌন্দর্য-বিষয়ে জাতিভেদে মতভেদ" এবং 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার "সৌন্দর্য কাহাকে বলে"—মূল্যবান এই প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ অজিতবাবু করেছেন। এরই সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর কয়েকটি রিভিয়্যুর আলোচনাও আসতে পারত। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে'র রিভিয়্যুতে, সাহিত্যে বাস্তবের রূপায়ণ সম্পর্কে তাঁর নির্দিষ্ট মত এবং দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল। সাহিত্যের রূপায়ণ-পদ্ধতি সম্পর্কে, ছন্দের প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ বিশেষ অভিনিবেশের বিষয়। এই প্রসঙ্গই মধুসূদনের চিঠিপত্রের অত্যন্ত তাৎপর্যময় মন্তব্যের কথা মনে আসে। য়ুরোপীয় রোমানটিক নন্দনভাবনার প্রগতি-ভূমিকা সম্পর্কে মধুসূদনেই প্রথম সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগবাদী পজিটিভিস্ট সৌন্দর্যদর্শনের ওদিকে মধুসূদনের, এদিকে রবীন্দ্রনাথের রোমানটিক অনুকাঙ্ক্ষায় রুচির এক সুস্থতর মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাৎপর্যময়। মধুসূদনের চিঠি ব্যবহার করে অজিতবাবু লেখায় একটি নতুন মাত্রা আনতে পারতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি আমাদের সাহিত্যে, শিল্পকলায় পুরানো সামাজিক নীতিবাদিতা এবং শিল্পীর স্বাধিকারের আদর্শের দোলাচল চলেছিল। এর মূলে পাওয়া যাবে বিপরীত দুই দর্শনের, বিপরীত নন্দন-দৃষ্টিরই বিরোধ। বিরোধ এবং উত্তরণ। ভেতর থেকে এই বিকাশের ইতিহাস উন্মোচনের কাজটি আমরা কেউ আজও করি নি। এ কাজ করতে হলেও দরকার যাবতীয় তথ্যের নির্ভর করার মতো একটি পঞ্জি। যতটা নতুন তথ্য এই বইয়ে আছে তা থেকে আমাদের সৌন্দর্যদর্শনের টানাপোড়েন অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। অনেক লেখক য়ুরোপীয় দার্শনিকদের ভাবনা থেকে ধার নিয়েছেন, ঠিক। কিন্তু কে কোন্ দর্শনের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন সে হিসেবের সঙ্গে তাঁদের প্রবণতার সামাজিক শিকড় সম্পর্কেও অবহিত থাকা দরকার। এই চেতনার অভাবে আলোচ্য বইটিতে নির্দিষ্ট বক্তব্য-সূত্র তৈরি হয় নি, গাঁথুনি আসে নি। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কাজটিতে লেগে থাকবেন এবং আরও গভীরে নামবেন আশা করা যাক।

থীসিস হিসেবে দাখিল করা লেখা হুবহু ছেপে বার না করলেই ভালো হত। অনেক ছাঁটকাট করা যেত। বার-বার একই কথা ফিরে-ফিরে বলা রয়েছে। এসব সম্পাদনা করলে বইটি ছিমছাম, সুপাঠ্য হত। খুঁজে-খুঁজে কষ্ট করে বের করা নতুন তথ্য অনেক ধারালোভাবে হাজির করতে পারতেন।

"রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বচিন্তা" সম্পর্কে আলোচনায় বা লম্বা গ্রন্থপঞ্জিতে কোথাও শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের কাজের উল্লেখ নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি।

সত্যজিৎ চৌধুরী

পল্লবিত পথ ধরে কবিতার অন্তঃপুরে

ঝর্ণা আমার আঙুলে—শামসুর রাহমান। নবার্ক, কলকাতা-৫৯। ১৯৮৭। পনেরো টাকা।

টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে—শামসুর রাহমান। নবার্ক, কলকাতা ৫৯। ১৯৮৬। বারো টাকা।

কোথাও যাবার কথা ছিল—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। নবার্ক, কলকাতা-৫৯। বারো টাকা।

প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে—মতি মুখোপাধ্যায়, নবার্ক, কলকাতা-৫৯। ১৯৮৫। বারো টাকা।

দেহকেই ফিরে পাওয়া—সুভাষ ঘোষাল। নবার্ক, কলকাতা-৫৯। ১৯৮৫। দশ টাকা।

বয়স আর অভিজ্ঞতার ভারেই শামসুর রাহমান এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অগ্রজ কবিদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত নবীন, অনুজ মতি মুখোপাধ্যায় ও সুভাষ ঘোষালের কাব্যগ্রন্থগুলিতে নিজস্ব সংবেদনার প্রকাশ কবিতার পল্লবিত পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তা ফিরে এসেছে নিজেরই অন্তঃপুরে। তাই আপন অনুভব, বোধ, সংরাগে সংশ্লিষ্ট কবিদের কবিসত্তার তন্নিষ্ঠ রূপটি অনায়াসে উঠে এসেছে। এই কারণেই শামসুরের কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়ে যায়—"ঝর্ণা আমার আঙুলে" কিংবা "টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে"। শামসুর দীর্ঘদিন ধরে কাব্যচর্চায় যুক্ত থাকার ফলেই অবলীলাক্রমে শব্দকে ছুঁয়ে, ছেনে নির্মাণ করেন কবিতার শরীর। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গদ্য-ছন্দের বিন্যাস ঘটান নিজস্ব ধাঁচে। আর এসবের মধ্যেই শামসুর নিজেকে চিনিয়ে দিতে পারেন সহজে। তিনি যখন লেখেন—'ভেতরে ফিসফিস কিসের দরজার পর্দায় / মেরুন রঙ দোল খায় প্রজাপতি / ওড়ে ঘরময় চেয়ার ছেড়ে উঠি আবার বসি / বুকের ভেতর কারখানার বয়লার / ঘোরাঘুরি ক্রমাগত পর্দা সরিয়ে / হঠাৎ তুমি নুড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসা ঝর্ণা / আমার আঙুলে' (ঝর্ণা আমার আঙুলে)—তখন টের পাওয়া যায় কিভাবে অনুভব-বোধের সঙ্গে নির্মাণ হাত-ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে।

বয়স শামসুরকে প্রাজ্ঞ করেছে, স্থিতধী করেছে। তাই আগেকার গিমিক এখন ইমেজের কাছে নতজানু। আসলে সময়ের অনুভব তাঁকে লিখিয়ে নিয়েছে—(১) 'তিনি বসেছিলেন শান্তিনিকেতনী মোড়ায় / চুপচাপ, চোখ জোড়া তাঁর / পর্যটক নক্ষত্রের চণ্ডীমণ্ডপে।' (দৃশ্য) (২) 'উইয়ের ঢিবিতে / আপাদমস্তক ঢাকা প'ড়ে কি/ বাল্মীকির মুখমণ্ডল ধারণ করেছিলো / এমন অনাবিল মহিমা?' (রূপালিজাল) (৩) ধুলিময় এক কোণে, চুকে-বুকে গেছে কত খেলা—/ আড্ডার দুর্বার লোভে বন্ধুদের সঙ্গে আর বসি না রোয়াকে / দৌড়ে গিয়ে চলতি বাসে উঠতে পারার বাহাদুরি/ দেখাতে পারি না আদৌ; সে-কৌশল বয়স নিয়েছে করে চুরি।' সমকালীন জীবনযাপনের টুকরো-টুকরো ছবি ছড়িয়ে আছে প্রায় প্রত্যেক কবিতায়। সে ছবি করুণ, কঠোর, কখনও বা স্মৃতির গন্ধে ভরপুর। অন্তর্গত যে সমস্যা সত্তার গভীর ছুঁয়ে ফিরে আসে করতলে তাকে শামসুর চিনে নিতে চান। ভালোবাসা, রাষ্ট্রীয় বিপন্নতা, কিংবা শৈশবের দিনক্ষণের কথা বলতে-বলতে আপাত লঘুতার আশ্রয়ও নেন তিনি। জাত কবির অনুভব নিয়েই তিনি সব অনাবিলতাকে অতিক্রমণেরও স্বপ্ন দেখেন—'স্বপ্ন দেখি একটি দেয়াল ধসে যায় জরাগ্রস্ত/মানুষের মতো আর্তনাদ করে, চাপা / পড়ে এক ঝাঁক কবুতর, শাদা, কালো পীত, / বেগনি, বাদামি, স্বপ্নে দেখি / পায়রার মৃত্যু ঘোড়াদের মৃত্যু দেখি। মৃত সব/ ঘোড়ার কঙ্কাল ফুঁড়ে, পোকামাকড়ের/ দঙ্গল ছাপিয়ে সূর্যমুখী / বুকে নিয়ে সূর্যোদয় জেগে ওঠে রাশি-রাশি /' (দ্বিতীয় দৃষ্টির জাগরণ) এ দুয়ের মধ্যে বেহালা, মাঝখানে, হে নির্বোধ ইত্যাদি কবিতাগুলিতে শামসুরের দক্ষতা যথেষ্ট প্রকাশিত। আরবি-ফারসি শব্দের অনায়াস ব্যবহার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কবিতাগুলোকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে।

এপার-বাঙলার অগ্রজ কবি অরুণ মিত্রকে উৎসর্গ করা "ঝর্ণা আমার আঙুলে" কাব্যগ্রন্থের তুলনায় "টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে"র কবিতাগুলিতে নিজেকে আবিষ্কারের প্রয়াস আরো গভীর। প্রথম কবিতায় আছে সেই আবিষ্কারের মগ্নতা—'প্রকৃত কে আমি এই মানুষের ব্যাপক মেলায়?/ বেলা গেলো মেঘে মেঘে, নানা খেলা খেলেছি এখানে / আবেগের ঘোড়ার সওয়ার হয়ে নিজের বিষয়ে।' আবিষ্কারের মগ্নতা তাঁকে নিয়ে যায় জীবনের

গভীরে, অন্তঃপুরে। জীবনে ফাঁক যেখানে যত বেশি আবিষ্কারের প্রয়াসও তত তীব্র সেখানে। সেই তীব্রতায় যুক্ত হয়ে যায় শ্লেষ—(১) 'যখন সে, তরুণ শিক্ষার্থী, ফিরে আসে / তার ঘরে টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ক্ষুধিত পাষাণে / যেরকম হাসির বর্ণনা আছে, ঠিক সেরকম।' (টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে) (২) 'আমার অক্ষরবৃত্তে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিমায়।/ পঞ্চাশ বছর গেছে অস্তাচলে, আমি বিবাহিত/হয়ে আছি অপরূপ কৌমার্যের অববাহিকায়।' (বিবাহিত) এরই পাশাপাশি জমা হয়ে থাকে প্রতীক্ষা, 'কোনো দূত এসে / এখানে রটাবে বার্তা, এই প্রত্যাশাকে / পাঠিয়ে দিয়েছি বনে অনেক আগেই। শুধু জানি বৃক্ষহীন / নদীহীন, রুক্ষ এ-প্রান্তরে প্রতীক্ষা করাই একমাত্র আশা॥' আমাকে প্রতীক্ষা করে যেতে হবে। দুঃখ-নিমগ্নতাও থাকে দাঁড়িয়ে—'সত্যি বলতে কি, সম্প্রতি দুঃখ যখন / আমার মুখোমুখি এসে বসে মোড়াটায় / ওর প্রাচীন দীঘির মতো / চোখে চোখ রেখে আগের মতো দুঃখ পাই না আর/ এবং এজন্যেই দুঃখ আমার ওপর ঝুঁকে থাকে।' (এবং এজন্যেই) এখন ডাকছো কাকে, তবু আসতেই হল, দরজায় দাঁড়ানো কেউ, রাস্তার ধারে, শ্রুতলিপি, ফেরা-না ফেরা কবিতাগুলি চমৎকার।

মঙ্গলাচরণের কবিতায় প্রাধান্য পায় মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, বঞ্চনা ভালোবাসার অন্বেষণ। "কোথাও যাবার ছিল" কাব্যগ্রন্থে আছে যেমন ১৯৭১-৭৪-এর মধ্যে লেখা কিছু কবিতা তেমনি আছে সাম্প্রতিক কালে লেখাও বেশ কয়েকটি কবিতা। মঙ্গলাচরণ হৃদয়ের অনুভব, উত্তাপকে সঠিক ভাবেই কবিতায় তুলে ধরতে পারেন। প্রথম কবিতাতেই তা টের পাওয়া যায়। তিনি যখন লেখেন—'হৃদয়, তোমাকে নিয়ে কি বিপদে পড়েছি কী বলি!/ ইতস্তত একদিন আত্মদানে সুখধন্য হতে / বলতে সর্বসমপর্ণে বন্দী বড় স্বাধীন জগতে—/ সে-জগৎ কতদূর? …তখন বোঝা যায় মঙ্গলাচরণ রয়েছেন অন্বেষণে। সেই অন্বেষণ-এর কথা 'তবে কেন' কবিতায় আছে অন্যভাবে—'আজন্ম বিখ্যাত ওই আবক্ষ আলোকচিত্র বাঁধা / ও কি মুখ—মমতা-মনীষা দয়া-বিদ্যা পারাবার? ও কি মুখ—বিরক্ত বিতৃষ্ণা তিক্ত কূপ ছড়াবার?/ তবে কেন চোখে ঠোঁটে উর্ণার রহস্য ছিল বাঁধা!'—বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত এই কবিতায় আছে দুঃখ, বঞ্চনার উৎসে যাবার প্রয়াস। হালকা চালে লেখা "কী বিচিত্র" কিংবা "হাসপাতালে", "এই রাত্রে" কবিতাগুলিতে আছে মানুষের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা, পূর্ণ না হয়ে ওঠার কারণগুলির অন্বেষণ। "কোথাও যাবার ছিল" শিরোনামে স্বতন্ত্র পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে অন্বেষণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে—'অন্ধকার থেকে আর কত অন্ধকারে যাব / কত অন্ধকারে যাব / কত অন্ধকারে!' (৩-সংখ্যক কবিতা), কিংবা 'চাচ্ছি যেতে / যেতে চাচ্ছি পায়ে-পায়ে অপর বৃত্তের দিকে অপর বৃত্তের কাছে / আলোর কেন্দ্রেই /' (৫-সংখ্যক কবিতা)।

নস্টালজিয়ার সূত্রে লেখা হয়েছে—"নাম বাংলাদেশ" ও "বুকের মধ্যে" কবিতা দুটি। নজরুলকে নিয়ে লেখা কবিতাটি বেশ দীপ্র। এছাড়া "ঢাকা, খোলো", "যাই, তবু", "সহসা মনের মধ্যে", "খরা", "নক্ষত্রের রাত" ইত্যাদি কবিতাগুলিতে মঙ্গলাচরণের নিজস্বতা, আপন উজ্জ্বলতার পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। দলবৃত্ত ছন্দের অনুসরণে, হালকা চালের কয়েকটি কবিতা আছে এই গ্রন্থে। শব্দচয়ন, চিত্রকলা রচনায় মঙ্গলাচরণ কতটা সিদ্ধহস্ত তা সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

মতি মুখোপাধ্যায়ের "প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে" কাব্যগ্রন্থটিতে ৪৪টি কবিতা আছে। "সন্ধ্যার জানালা" বা "স্থিতাবস্থা ভাঙো" কাব্যগ্রন্থের তুলনায় এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি অনেক পরিণত। সংবেদনা, আন্তর উপলব্ধি, শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্প—সব দিক থেকেই কবিতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে মতি মুখোপাধ্যায়ের চেতনার আকাশটাকে চিনিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ছোটো-ছোটো কবিতাগুলিতে মতি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পারেন বরাবর, এক্ষেত্রেও তা বর্তমান। প্রথম কবিতার "লোহা"র মধ্যে সংবেদনা স্বল্প পরিসরে মূর্ত হয়ে ওঠে—'সমস্ত রাত চাঁদ ছিল না, কেবল লোহা ছিল / লোহার থেকে চাঁদের মতো জোৎস্না ঝরেছিল / আগুন আগুন জ্যোৎস্না আমায় পুড়িয়ে মেরেছিল।' অন্ত্যমিলের ফলে একটা ঝংকার শোনা যায়। অধিকাংশ কবিতায় এমনটি লক্ষ করা যায়। মতি লঘু শব্দে, স্বল্প পরিসরে অনেক বড়ো বিষয়কে টেনে আনতে পারেন; 'পাথর ভাঙছে' কবিতাটিতে আছে এমনই প্রকাশ—'পাথর ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে / প্রতিদিন আমি ফুল ফুটতে দেখি / বাগানে ফুল / কোয়ারিতে পাথর / সোনালি রোদে উড়ে আসছে প্রজাপতি / ছুটে আসছে ট্রাক / বাতাসে উড়ছে হলুদ শুকনো পাতা / ময়লা নশ্বরী নোট।' আপন

অস্তিত্বের চারপাশে জড়ো হয়ে থাকা নানা বিষয় অনুভূতির গভীরতায় উঠে এসেছে কবিতাগুলিতে। 'আত্মপ্রকাশ' কবিতাটিতে আছে সেই অনুভূতির প্রচ্ছায়া—'বিন্দু বিন্দু রক্তের ক্ষরণ / পেরেকের মুখে / সুখের আড়াল থেকে সুখতলা থেকে উঠে আসা / যেন শেষবার / কবে এক পশুহত্যা হয়েছিল বলে / জন্মান্তরের। সুগভীর যন্ত্রণায় প্রতিবাদী, প্রতিশোধকামী। এই তবে আত্মপ্রকাশ? জন্মবৃত্তান্ত, শাদা, মোমবাতি ইত্যাদি কবিতাগুলি, সত্যিই ভালো। কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থের শেষ কবিতাটিও (সত্তরের যুবক কবি) তাঁকে নিয়ে লেখা।

"দেহকেই ফিরে পাওয়া" সুভাষ ঘোষালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থেও আছে মোট ৪৪টি কবিতা। সুভাষের কবিতায় একধরনের মগ্নতা, নৈষ্টিক চেতনা, মিসটিসিজমের প্রকাশ আছে। প্রথম কবিতা 'করযোড়ে'। তিনি যখন লেখেন—'নিত্য মেঘের মাঝখানে দিয়ে আলো উত্তরবাহিনী / বধিরও জেনেছে কতো প্রয়োজন স্তবে/ আমি কোন কিছু প্রমাণ করতে কখনও বাইরে যাই নি / তবে কি আদতে কিছু সম্ভব হবে?'—তখন বুঝি কোনো নিমগ্নতায় তিনি পৌছতে চান। একই শব্দের পুনর্ব্যবহার, কলাবৃত্তের ছন্দের প্রতি ঝোঁক, পেলব চিত্রকলা—এসবের মধ্যে সুভাষের কবিতাগুলি টানটান হয়ে থাকে। মিসটিসিজমের ছোঁয়া কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'তুমি বলেছিলে বড় হয়ে গেছে হাওয়া / এবারে আবার দেহকেই ফিরে পাওয়া / যে কোন সময় সম্ভব শুধু যদি / হৃদয়ের দিকে উঠে যেতে পারে ধী।' (বিভাসের দিকে বাড়ি) গাছপালা, পশু, পাখি, নদী, ঝরনা নানাভাবেই উঠে এসেছে কবিতাগুলির মধ্যে। 'নিজেকে', 'এই ভালো', 'শীতে অনুরোধ', 'অন্তের অশ্রু', 'রেখাচিত্র', 'তথ্যচিত্র', 'তখনই অন্ধ' কবিতাগুলি আগামী দিনে সুভাষকে কবিতার আরো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ, ছাপা, কাগজ অনায়াসে দৃষ্টি কেড়ে নেয়; অবশ্য এর জন্যে প্রশংসার সবটুকুই প্রকাশক বিরাম মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

তাপস বসু

লিটল ম্যাগাজিন : প্রাপ্তিস্বীকার

সংবেদ (আষাঢ় ১৩৯৪)। সম্পাদক শরৎসুনীল নন্দী, ৫৯৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭৭।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক কাগজটির এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংযোজন সিদ্ধার্থ রায়ের প্রবন্ধ "সিদ্ধেশ্বর সেন-সময়ের ডানার ভিতর।" ভগীরথ মিশ্র ও রামচন্দ্র প্রামাণিকের দুটি সুন্দর গল্প, তিনটি প্রবন্ধ, একগুচ্ছ কবিতা এবং আলোচনা-সমালোচনায় পত্রিকাটি খুবই সুন্দর। মুদ্রণ-অলংকরণ বেশ উচ্চমানের।

সংবিত্তি-এক। প্রকাশক পল্লব রায়। পাটপুর, বাঁকুড়া।

প্রকাশ কর্মকারের আঁকা প্রচ্ছদে শোভিত পত্রিকাটি বিষয়ে, মুদ্রণে খুবই উঁচুমানের। অমিয়ভূষণ, উদয়ন ঘোষের দুটি অপূর্ব-সুন্দর গল্প ছাড়াও কমল চক্রবর্তী, আবুল বাশার, সুরজিৎ সেনের গল্প; প্রকাশ কর্মকার সব সাক্ষাৎকারেই যেমন বলেন তেমনি কাটা-কাটা একটি সাক্ষাৎকার; আরো তিনটি প্রবন্ধ, কবিতা আর অনুবাদ গল্প-কবিতা-নিবন্ধ ছাড়াও এই সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য সংযোজন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন, কবিতা ও কালপঞ্জী-বিষয়ক মানবেন্দু রায়ের শ্রম-সাপেক্ষ রচনাটি। বাংলাদেশের শক্তিমান কবি আহসান হাবীব সম্পর্কিত "একটি খসড়া চিত্র" ও "প্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠান" উল্লেখযোগ্য।

সীমান্ত (নভেম্বর ১৯৮৭)। সম্পাদক সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-দীপেন রায়। ৩৮৮ বাঁশদ্রোণী পার্ক। ২৪ পরগনা।

মলাটে 'মানুষ মেরেছি আমি' উল্লেখিত এই সংখ্যাটি দাঙ্গা-বিরোধী সংখ্যা। "আমরা তোমার শবাধার বই" এবং "নিহত ভ্রাতার ভাই আমি" দুটি পর্যায়ে ১১ জন ৪০-৫০ দশকের কবির কবিতা/ কবিতার অংশবিশেষের পুনর্মুদ্রণ এবং একগুচ্ছ নতুন কবিতা সংযোজন করে দাঙ্গা-বিরোধী কবিতার একটি ধারাবাহিক রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এপ্রিল ১৯৫০ 'পরিচয়'-এর পাতা থেকে নিয়ে ছেপেছেন সরোজকুমার দত্তের "লেখকের প্রতি" প্রাসঙ্গিক রচনাটি। গল্প বিভাগের দুটি গল্প পত্রিকাটির মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে নি।

খনন (অকটোবর ১৯৮৭)। সম্পাদক সুকুমার চৌধুরী, সুব্রত পাল। ৩৮ দেওটেল লে-আউট। নাগপুর, মহারাষ্ট্র।

খ্যাতিমান শিল্পী ভাউ সমর্থের আঁকা প্রচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে নাগপুর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি খুবই সমৃদ্ধ। মরাঠি উপন্যাসের বিস্তৃতপরিচয়মূলক বিপ্লব চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি ছাড়াও নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের সাক্ষাৎকার এবং একটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা। মরাঠি গল্প-কবিতা অনুবাদের পাশাপাশি কিছু কবিতা ছাড়াও সোমেন চন্দের "প্রান্তর" গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

দিগন্তবলয় এপ্রিল-১৯৮৭। সম্পাদক বরুণ দাস। ১৪/১ পলিটেকনিক রোড, কলকাতা-৮১।

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ, গ্রুপ থিয়েটার-প্রযোজিত নাটক নিয়ে পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার ও অভিজ্ঞ দর্শকের ১৩টি আলোচনা আর সাক্ষাৎকারে এই সংখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য আলোচকরা হলেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমর মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রাজু দাস প্রভৃতি।

মানসলোক (শারদ ১৩৯৪) স. জয়ন্ত চক্রবর্তী ও অন্যান্য। দুবরাজপুর, বীরভূম।

এই সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য রচনা উদয়ন ঘোষের অনুভব-নিবন্ধ 'জীবনানন্দের রিস্টওয়াচ'। আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের 'বাউলের ঘর ও বাহির' বাউল-বিষয়ক বিশ্লেষণ-মূলক নিবন্ধটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া একগুচ্ছ কবিতা ও অনুপম দত্তের একটি গল্প সংযোজিত হয়েছে।

পঞ্চমা (আশ্বিন ১৩৯৪) সম্পাদক সোফিওর রহমান। টেরাপেখিয়া, মেদিনীপুর।

এই সংখ্যাটিতে দু-বাঙলার একগুচ্ছ কবিতা আর গল্প ছাড়া 'কবির তৃতীয় নয়ন / দূরদৃষ্টি' প্রসঙ্গে ১১ জনের মতামত এবং অনুভব সংযোজিত হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রভাসচন্দ্র চৌধুরীর একটি অনবদ্য তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ ও কবির স্ত্রীর মোহিতলাল-স্মৃতিকথা এই সংখ্যাটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

চয়ন (শারদ ১৩৯৪) সম্পাদক সৌরেন চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী। কলেজপাড়া, রায়গঞ্জ, প. দিনাজপুর।

হরেন ঘোষের "নেপালী গদ্যের উদ্ভবকাল" ও আশুতোষ রায়ের "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টিতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন" বিষয়ক দুটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা-প্রবন্ধ ছাড়া একগুচ্ছ কবিতা-গল্পের সংকলন।

অনার্য সাহিত্য (জুলাই ১৯৮৭) সম্পাদক শ্রীধর মুখোপাধ্যায়। ৮ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা-৬

সাতজন কবির ব্যক্তিগত অনুভব-ভাবনা ও কবিতার একত্র সমাবেশ। কিছু কবিতা খুবই উঁচুমানের।

কৃশাণু (২য়-৩য় সংখ্যা ১৯৮৭) সম্পাদক দীনেশ সিংহ। ৩০ / ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

পরিচ্ছন্ন ছাপা ছোট্ট পত্রিকাটিতে একগুচ্ছ কবিতা, প্রমথ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ 'জীবন শিল্প ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়' সহ তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

কবিতাযুগ—৩ (অকটোবর ১৯৮৭) সম্পাদক তুষারকান্তি দাশ। শওয়ালেশ কোয়ার্টার, হলদিয়া, মেদিনীপুর।

একগুচ্ছ কবিতা ও কবিতার আলোচনায় ছিমছাম এই সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্যামল দত্তরায়।

বসুধা (শারদ ১৯৮৭) সম্পাদক অমলেন্দু দত্ত। ৩৯-এ গোপাল মিত্র রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪।

কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন। মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

প্রিয় মেঘদূত (শারদ ১৯৮৭) সম্পাদক অশোক আচার্য। চাকদহ রোড, বনগ্রাম, উত্তর ২৪-পরগনা।

কবিতা আর প্রবন্ধের সংকলন। কবিতা বিষয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আছে। ছাপা চলনসই।

তমসুক (শারদ ১৯৮৭) সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনগর, কোচবিহার

হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিসত্তার কবি আনন্দ বাগচী' চমৎকার নিবন্ধটি ছাড়া একগুচ্ছ কবিতার সুন্দর সংকলন।

কবিতা কবিতা (শারদ ১৩৯৪) সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, দীপংকর রায়। বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪-পরগনা।

১৩-জন কবির কবিতার সংকলন। ছাপা, অঙ্গসজ্জা খুবই সুন্দর।

সতীদাহ প্রসঙ্গে

Socioeconomic Impact of Sati in Bengal and the Role of Raja Rammohun Roy—Benoy Bhusan Roy. Naya Prakash, Calcutta 6. 1987. Rs 180-00. Pp V-VII+226.

ভারতে সতীদাহপ্রথা নিয়ে বর্তমানে যে আলোড়ন চলছে তার পটভূমিকায় বিনয়ভূষণ রায়ের গ্রন্থটিকে সময়োপযোগী বলা যায়।

গ্রন্থে মুখ্যত পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়—ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপট। দ্বিতীয় অধ্যায়—বঙ্গদেশে সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন। তৃতীয় অধ্যায়—

সামাজিক ও জনবিষয়ক পটভূমি। চতুর্থ অধ্যায়—অর্থনৈতিক পটভূমি। পঞ্চম অধ্যায়—রাজা রামমোহনের ভূমিকা। পাঁচটি অধ্যায়ের শেষে উপসংহার। পরিশিষ্টে বিভিন্ন সারণী ও মানচিত্র। এ ছাড়া রয়েছে গ্রন্থসূচী ও নির্ঘণ্ট। মূল অধ্যায়গুলি ১৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পরিশিষ্ট পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী।

প্রথম অধ্যায়ে সহমরণপ্রথার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের কোনো উল্লেখ নেই। অথর্ববেদে মৃত স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী কিছুক্ষণ শায়িত থাকেন বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে সতীদাহের সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য সতীদাহ বিষয়ে নীরব। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতারা স্ত্রীলোকের ও বিধবাদের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করলেও সতীদাহের সমর্থনে কিছু বলেন নি। মহাভারতে একমাত্র মাদ্রীর ক্ষেত্রে সহমরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণেও মাত্র একটি ঘটনার বিবরণ পাই—বেদবতীর মায়ের সতী হওয়ার ঘটনা। পুরাণগুলিতে দুয়েকটি সতীদাহের প্রসঙ্গ রয়েছে। মুসলিম আমলে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। মার্কোপেলো, ইবন বতুতা, রালফ্‌ ফিচ, উইলিয়ম হকিন্‌স্‌, জোব চার্নক ও আলেকজানডার হ্যামিলটন প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকেরা সতীদাহের কথা বলেছেন। ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত যে-সকল সরকারি নথিপত্র পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয়, অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বঙ্গদেশে সতীদাহের সংখ্যা ছিল অধিক। এর একটি কারণ ভবদেব ভট্ট, শূলপাণি, রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ, গোপাল ন্যায়পঞ্চানন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় স্মৃতিকাররা সতীদাহের সমর্থক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ইংরাজ শাসকেরা ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেকটার্সের সভাপতি ন্যাথানিয়েল স্মিথ ওয়ারেন হেস্টিংসকে সতীদাহবিষয়ক আইন সম্বন্ধে সন্ধান নিতে নির্দেশ দেন। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির নীতি ছিল ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি ও প্রথাসমূহে হস্তক্ষেপ না করা। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবাদের জেলা-শাসক ক্রুক সতীদাহ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আদেশদানের জন্য কর্নওয়ালিশকে পত্র দেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস র‍্যাট্রে অনুরূপ আর-একটি চিঠি লেখেন গভর্নর-জেনারেলকে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিসট্রেট নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রারকে পত্র দিয়ে সতীদাহ বিষয়ে সরকারের সঠিক নির্দেশ কী, তা জানতে চান। এর পর গভর্নর-জেনারেল পুলিশকে আদেশ দিলেন সতীদাহের পূর্বে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, সহমরণোদ্যত নারীরা শাস্ত্রানুমোদিত বয়ঃপ্রাপ্ত কিনা, গর্ভবতী কিনা, এবং তাকে মাদকদ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে কিনা। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজামত আদালত সমস্যাটি আলোচনা করে সতীদাহবিষয়ক প্রচলিত আইনের সংশোধনের জন্য সুপারিশ করেন। সরকার কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে কুণ্ঠিত হলেও খ্রীষ্টান মিশনারি ও ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। স্বয়ং উইলিয়ম জোনস্‌ সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে দাবি করেন। বিভিন্ন আন্দোলনের পরিণামে গভর্নর-জেনারেল বেনটিঙ্ক বেঙ্গল কোডের সতেরো সংখ্যক রেগুলেশন অনুযায়ী সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত, ভারতীয় সমাজের বিকাশ, বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের আমল ও কৌলীন্য-প্রথার সূত্রপাত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সহমরণ ছিল পূর্বে ঐচ্ছিক। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শাসনের ফলে তা ক্রমে কঠোর রূপ নেয়। হিন্দু সমাজে সর্বত্র সতী হওয়া সমর্থনীয় ছিল না। পেশবা পরিবারে একমাত্র রমাবাঈ সতী হন। রানী অহল্যাবাঈ, রানী ভবানী ও তাঁর কন্যা—এঁরা সতীপ্রথার সমর্থক ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশ সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন মল্লিক, শ্যামাচরণ শীল প্রভৃতি ব্যক্তিও একাজে অগ্রণী হন। বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করেন টাকীর জমিদার রায় কালীনাথ চৌধুরী। অবশ্য অনেক পণ্ডিত প্রথমে উৎসাহ দেখিয়ে পরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। ব্যতিক্রম ছিলেন "সংবাদ ভাস্কর"-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে জনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে ৫৩৮৮ জন মহিলা সহমরণে যান। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবারভুক্ত ছিলেন ১০৭৯ জন, বাকিরা অন্যান্য বর্ণসম্ভূত। বছরওয়ারি হিসেবে ১৮১৫ সালে ২৮১ জন, ১৮১৬ সালে ৩২৩ জন, ১৮১৭ সালে ৫১১ জন, ১৮১৮ সালে ৬১৫ জন, ১৮১৯ সালে ৪৬৭ জন, ১৮২০ সালে ৪০৭ জন, ১৮২১ সালে ৪২৯ জন, ১৮২২ সালে ৩৬৯ জন, ১৮২৩ সালে ৩৫৯ জন, ১৮২৪ সালে ৪২৫ জন, ১৮২৬ সালে ৩৫১ জন, ১৮২৭ সালে ৩৬৩ জন সহমৃতা হন। এই সঙ্গে জেলাভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অপর পক্ষে ভবদেব ভট্ট, শূলপাণি, রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মৃতিকাররা সতীদাহ-সমর্থক।

পূর্বোক্ত ৫৩৮৮ জন সতীর মধ্যে ২১২৪ জনের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক এদের সম্বন্ধে লব্ধ তথ্য অনুসারে অর্থনৈতিক পটভূমি বিবৃত করেছেন। এ থেকে জানতে পারি বিত্তবান পরিবারের ৬০১ জন, মধ্যবিত্ত পরিবারের ৪৫৫ জন সতী হন। লেখক এদের জেলাওয়ারি বৃত্তিগত বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্গদেশে দায়ভাগপ্রথা চালু থাকায় এমন-কি যৌথ পরিবারেও অপুত্রক বিধবার স্বামীর মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তিতে স্বামীর মতোই অধিকার থাকে। তাঁদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সতী হতে প্ররোচিত করা হত। কলকাতাবাসী যেসব মহিলা সতী হন নি, পরে দেখা গেছে তাঁদের অনেককে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজা রামমোহনের সতীদাহনিরোধের জন্য প্রচেষ্টার বিবরণ পাই। দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতির আদেশে জজপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ সালে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন, কিংবা অনুমৃতা হতে পারেন। তবে তাঁর মতে, সংযত জীবনযাপনই আইনের সঙ্গে সুসংগত, সহমরণ নয়। সহমরণ ব্রহ্মচর্যের বিকল্পমাত্র, এবং বিকল্প ব্যবস্থা কখনো আইনের পূর্ণ সমর্থন পেতে পারে না। ইউনিটারিয়ান হিন্দু কমিউনিটি নামক সংগঠনের সচিব বৈকুণ্ঠলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যারা মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে বেঁধে চিতায় তোলে এবং কাঁচা বাঁশ দিয়ে তাকে জলন্ত চিতায় চেপে রাখে তারা নরহত্যাকারী। শ্যামাচরণ শীল মতপ্রকাশ করেন সদ্যোবিধবার সঙ্গে তার আত্মীয়দের দেখা করতে দেওয়া উচিত নয় এবং বিধবাকে তারা যেন মাদকদ্রব্য সেবন না করায় তার দিকে লক্ষ রাখা কর্তব্য। এই পরিবেশে রামমোহন তাঁর সহমরণ-বিরোধী নিবন্ধসমূহ প্রকাশ করতে থাকেন। রামমোহন সতীদাহের তীব্র বিরোধী হলেও তখনই কোনো কড়া আইন প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিল, সতীদাহের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে এর প্রকোপ কমানো। বেন্টিঙ্ক-কর্তৃক সতীদাহনিরোধক আইন প্রবর্তিত হলে হিন্দুসমাজের একাংশ এতে ক্ষিপ্ত হন। তবে উদারবুদ্ধি ব্যক্তিরা এদের প্রতিষ্ঠান "ধর্মসভা"কে গুড়ুমসভা, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঙালীচরণ এবং "সমাচারচন্দ্রিকা"কে কুচন্দ্রিকা বলে বিদ্রূপ করতেন। আশ্চর্যের বিষয় রামকমল সেন প্রথমে সহমরণবিরোধী হলেও পরে সতীদাহনিরোধ আইনের অবসান দাবি করেন।

পূর্বে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহে বাধা ছিল না, কিন্তু ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এ প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা ধনবান ব্যক্তিদের তোষণ করে তাদের ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। উপসংহার অংশে লেখক বলেছেন, ইংরাজ শাসকেরা সতীদাহ-নিরোধক আইন প্রবর্তনে দীর্ঘকাল দ্বিধান্বিত থাকলেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কারমুক্ত ভারতীয়েরা তাঁদের প্রণীত আইনকে পূর্ণ সমর্থন করেন।

পরিশিষ্টের সারণীগুলি বিলাতের পারলামেনটের বিবরণীসমূহ এবং লনডনের ইনডিয়া হাউসে রক্ষিত নথিপত্রের ভিত্তিতে প্রস্তুত। সতীদাহপ্রথা সম্বন্ধে কেউ গবেষণা করতে চাইলে এই সারণীগুলি থেকে অনেক তথ্য পাবেন। মানচিত্রগুলিও যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি রচনায় লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সহায়ক ও আকর গ্রন্থের বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন তিনি। তবে, নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থপ্রবন্ধাদির উপর এতটা নির্ভর করা সমীচীন হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট, কাগজ মূল্যবান, প্রচ্ছদটিও সুদর্শন। দাম একটু বেশি ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, দুর্বল ভাষা গ্রন্থটির মর্যাদা শোচনীয়রূপে লাঘব করেছে। পরবর্তী সংস্করণে কোনো সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে দিয়ে ভাষা আগাগোড়া মার্জিত করা হবে বলে আশা রাখি।

রণেন্দ্রনাথ দেব

ধর্ম ও আধুনিক সমাজ

সনাতন মিত্র

ঠিক এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না কে বলেছেন, কিন্তু এইরকম ধরনের একটা কথা কে যেন বলেছেন যে, কোনো বৃহৎ সত্যকে এই দেখে চেনা যায় যে, সেটা যেমন সত্য, তার উলটোটাও তেমনি সত্য। আবার 'বৃহৎ সত্য' সম্পর্কে এই মন্তব্যটার উল্লেখ করার সঙ্গে-সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়, এটা যদি একটা বৃহৎ সত্য হয়, তাহলে এর উলটোও অবশ্যই সত্য, কোনো বৃহৎ সত্যকে এইভাবে চেনা যায় যে তার উলটোটা কখনোই সত্য নয়। বাস, এর পর আর এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো পথ রইল না ; অনন্ত কাল এতেই ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে।

ধর্ম নামে অতিশয় বৃহৎ এবং জটিল বস্তুটি সম্পর্কে কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই মনে হয়, ধর্মের বিষয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই মনে হয়, সে কথার উলটো কথাটাও হয়তো সত্য। তবু বড়ো করে নয়, ছোটো করে ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, অর্থাৎ রিলিজিয়ন, তার বেলাতেই এমন ধাঁধা লাগে, বৃহত্তর অর্থের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এই রিলিজিয়ন অর্থে যে ধর্ম, অর্থাৎ যাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে, তার সম্বন্ধে কোন্ কথাটি যে সত্য, আর কোন্‌টি নয়, ঠিক করে বলা খুব মুশকিল। যদি বলি, ধর্ম মানুষকে সংকীর্ণ করে, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়, কেন, উদারও তো করে। যদি বলি ধর্ম মানুষকে সদয় করে, সঙ্গে-সঙ্গে বলতে হয়, নির্দয়ও করে। যদি দাবি করি, ধর্ম মানুষের অশেষ উপকার সাধন করেছে, পরমুহূর্তেই মানতে হয়, ক্ষতিও কম করে নি। এই নিয়ে যখন দুজনে তর্ক বাধে, তখন সন্দেহ জাগে, দুজনে কি একই বিষয় নিয়ে তর্ক করছে ?

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন :

My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race. I cannot, however, deny that it has made some contributions to civilisation. It helped in early days to fix the calendar, and it caused Egyptian priests to chronicle eclipses with such care that in time they became able to predict them. These two services I am prepared to acknowledge, but I do not know of any others.

(Why I Am Not a Christian : Chapter II)

অর্থাৎ, ধর্মের কাছে মানবসভ্যতার প্রাপ্তি বলতে রাসেল যতদূর জানেন (কিংবা মানেন), ওই পর্যন্তই, আর কানাকড়িও নয়। কিন্তু, আমরা জানি, ধর্মেরই অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর নানা দেশে মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সংগীতে, সাহিত্যে এবং নানাবিধ জ্ঞানচর্চায়। তা হলে রাসেল যখন বলেন 'ধর্ম', তিনি কি অন্য কোনো বস্তুর কথা বলেন ?

অবশ্য, বলা যায়, মানুষের মধ্যে যেহেতু সৃষ্টির এবং জ্ঞানান্বেষণের ক্ষমতা এবং প্রয়োজন বর্তমান, অতএব ধর্মীয় অনুপ্রেরণা না থাকলেও সে শিল্প আর সাহিত্য সৃষ্টি করত, জ্ঞানের অন্বেষণ করত, গির্জা না বানালেও যে সুরম্য

অন্য পথে

অট্টালিকা নির্মাণ করত, যজ্ঞবেদী রচনার প্রয়োজনে না হলেও, জ্যামিতির চর্চা করত। কিন্তু তা হলে আর ক্যালেনডার কিংবা চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণের ব্যাপারে একান্ত-ভাবে ধর্মের কাছেই আমরা ঋণী, এ কথা বলি কী করে ?

আবার, রাসেল যখন বলেন ভয় থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, কিংবা আরেকটু বিস্তারিত করে যখন দেখান :

It would seem, therefore, that the three human impulses embodied in religion are fear, conceit and hatred.

(Why I Am Not a Christian : Chapter II)

তখন প্রশ্ন জাগে, মাদার টেরেসা কিংবা আলবার্ট শোয়াইটজার যেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, সেটা কী ? ধর্ম বলতে রাসেল যা বুঝেছিলেন তা নয় ?

ধর্ম কথাটার শব্দতাত্ত্বিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুব সহজ, কিন্তু আসলে আমাদের জীবনে কী তার অর্থ, কী তাৎপর্য, কী ভূমিকা, অত সহজে বোঝা যায় না। কেউ বলতে পারেন, আমার জীবনে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই, আমি ঠাকুর-দেবতা মানি না, পুজো-আর্চায় বিশ্বাস করি না, মন্ত্র-

তন্ত্র সব বুজরুকি বলে মনে করি। আবার কেউ হয়তো বলবেন, আমি ঈশ্বর মানি, আত্মা আছে মানি, কিন্তু ধর্মের নামে যত কুসংস্কার সেসব মানি না। কেউ পরব্রহ্ম থেকে আরম্ভ করে ওলাইচণ্ডী পর্যন্ত সবই মানতে পারেন, আবার কেউ হয়তো কিছুই না মানতে পারেন, কিন্তু তাতে কিছুই যায়-আসে না, জলের মধ্যে যেমন মাছ থাকে, আমরা তেমনি ধর্মের মধ্যে আছি।

এবং সে ধর্ম তা বিজ-মাদুলি, ও তৎসৎ; দান-খয়রাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছু নিয়েই। আসলে মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় প্রয়োজন, তা সে যত উচ্চই হোক আর যত নীচই হোক, ধর্ম তার সব কটিকে এমনভাবে কোলে টেনে নিয়েছে, ঠিক তার দেহ-মনের contour-এর সঙ্গে খাপে-খাপে মিলিয়ে, এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যে তাকে পরিত্যাগ করা কি অস্বীকার করা মানে, যেন নিজেকেই পরিত্যাগ করা, অস্বীকার করা।

আত্মা মানি না বলা সহজ, কিন্তু মৃত্যুতে নিজের ঐকান্তিক লয় মেনে নেওয়া সহজ নয়। ধর্ম বলছে, ভয় নেই, তুমি থাকবে, বরং আরও ভালোভাবে থাকবে। বিজ্ঞানের অশেষ গুণপনায় আমরা সবাই বিশ্বাস করি, কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞান ঘেখানে গিয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছে সেখানে ধর্ম এসে হাল ধরছে, বলছে, ভয় নেই, আমি আছি, তখন কী করে তার দিক থেকে মুখ ফেরাই ? তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কার দিকে তাকাব ?

মানুষের ব্রত, কম্পিত অন্তরাত্মার হাত ধরে ধর্ম বলে, ভয় নেই, আমি আছি, তুমিও থাকবে। এবং সে আশ্বাস যদি বলি মিথ্যা, তাতেও ধর্মের কোনো হানি হয় না। আমি তো তা বলবই, আমি তো মূঢ়, অন্ধ, জড়বাদী। প্রথমত, কোনো অকাট্য প্রমাণ আমার হাতে নেই যে, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা বলে কোনো-কিছুর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। দ্বিতীয়ত, তেমন কোনো প্রমাণ যদিও বা আমার হাতে থাকত, ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোনো প্রমাণ যদি থাকত, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির গর্বতাই তাতে প্রমাণিত হত।

আর, তা ছাড়া, এটা যুক্তিতর্কের ব্যাপারই নয়, বাঁচা-মরার ব্যাপার। যা আমাকে অমৃতত্ব দান করবে না, তা নিয়ে আমি কী করব ?

এই একটা গেল ভয়ের দিক। রাসেল ঠিকই বলেছেন, একমাত্র ভয় থেকে যদি নাও-বা হয়, ভয় থেকেও ধর্মের উৎপত্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ভয় চিরন্তন, একেবারে জীবধর্মের মূলে তার বাসা, মৃত্যুর ভয়, ঐকান্তিক বিলুপ্তির ভয়। এর হাত থেকে জীবের উদ্ধার নেই।

কিন্তু ভয় ছাড়া আরও অনেক বৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে। তার মধ্যে একটাকে প্রত্যক্ষ করা গেল রাজস্থানে কিছুদিন আগে। যদি দেওরালার "সতী"কে জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়ে থাকে, তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় পুড়ে মরেছেন, সেটাও অসম্ভব নয়। ধর্মের জন্যে (পতিপ্রেমের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা ভালো-বাসা এইভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে লক্ষ-লক্ষ লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘোষণা করে না) আত্মবিসর্জন নতুন কিছু নয়। অবশ্য একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই ধরনের মৃত্যুবরণের পেছনে সত্যিকারের ধর্মবোধ কতখানি থাকে আর কতখানি অন্য ধরনের তাগিদ কাজ করে, বলা কঠিন। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়, আসল কথা হচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ লোক এটাকে ধর্মের জন্যে আত্মবিসর্জন বলেই জানল। তাই, ব্যাপারটা নিয়ে জনচিত্ত যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখন অবাক হবার কিছু থাকে না। কোনো একটা মহৎ আদর্শের জন্যে, এবং বিশেষ করে ধর্মের জন্যে তো বটেই, আত্মাহুতি দান আমরা চিরকাল চূড়ান্ত সংকর্ম বলে মনে করে এসেছি। এবং নির্ভীকতার, নিষ্ঠার, আত্ম-ত্যাগপরায়ণতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয় ধর্ম।

তেমনি, আবার সেই দেওরালা গ্রামে যারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের চোখে "সতী"র আগুনে পুড়ে মরা দেখছিল, তাদের হীনতম, সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে জঘন্য আকাঙ্ক্ষার পুর্তিও যে সেখানে হচ্ছিল না, তাই বা কে বলবে ?

রাসেল স্পেনের ইনকুইজিশনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ধর্মের নামে যাদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের "ভ্রান্ত" ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছেন বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে আগুনে পোড়াবার আগে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হবে, এইরকম নাকি একটা ব্যবস্থা ছিল, যাতে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হবার যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে না হয়। এতে নাকি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর থেকে প্রবল আপত্তি হয়ে উঠেছিল, কেননা তাঁরা জ্যান্ত লোকের পুড়ে মরাই দেখতে এসেছেন, মরা লোকের আগুনে পোড়া দেখতে আসেন নি। দেওরালাতেও সতীত্বের প্রদর্শন নানা জনের নানা প্রবৃত্তিকে অবশ্যই চরিতার্থ করে থাকবে।

'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি যখন বলেন :

মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতাঙ্ক লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদ্দি বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন অনন্ত ধর্পরে তাঁর—

তখন দেখি ধর্ম মানুষের হিংস্রতাকে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

মানুষ বলতে যা-কিছু বোঝায়, ভালো-মন্দ, উচ্চ-নীচ, উদার-সংকীর্ণ, তার সবকিছুকেই ধর্ম যেন ডাক দিয়ে বলছে, আমার কাছে এসো, তোমাদের সকলকে নিয়েই আমার সংসার। যদি বলি, মন্দ যা-কিছু ধর্ম বলে লোকে মানে, তা হল ধর্মের বিকৃতি, সেসব ছেঁকে ফেলে দিয়ে যা বাকি থাকে, সেইটাই আসলে ধর্ম, তা হলে মনে না পড়ে পারে না, কতবার সে চেষ্টা হয়েছে, কতবার সে চেষ্টাকে পেছনে ফেলে ধর্ম নিজের পথে এগিয়ে চলেছে।

তার মানে এই নয় যে, বিশ্বের প্রধান-প্রধান ধর্মের প্রবর্তনে নৈতিক দিক থেকে মানুষের কিছুই লাভ হয় নি, নৈতিক বোধে মানুষ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। লাভ অবশ্যই হয়েছে, নৈতিক অগ্রগতির পথে মানুষ অনেক দূর এগিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্ম যদি শুধু-মাত্র নীতি আর সদাচারের শিক্ষাই নিয়ে আসত, আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চমাংশে এসেও তাকে নিয়ে এত ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন যে হত না, আশা করি সবাই সে বিষয়ে একমত হবেন। তা হলে কতটুকু প্রভাব থাকত তার, কতটুকু শক্তি থাকত মানুষের জীবনে?

ধর্মের মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা মানুষের ঐহিক জীবনের পক্ষেও হিতকর, এমন কি যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষেই উপকারী। কিন্তু ধর্মের আসল জোর সেখানে নয়। ধর্ম যেখানে প্রায় অজেয় শক্তির অধিকারী, সেখানে তার কোনো প্রতিযোগী নেই, কোনো প্রতিপক্ষ নেই। সেখানে সে মানুষের যে প্রয়োজন মেটায়, আর কারও সাধ্য নেই তা মেটাবার।

অত্যন্ত সাধারণ মানুষও, তার দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার, ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠতে চায়, ধর্ম তাকে সে জীবন থেকে একটু উঁচুতে তুলে ধরে, তার সংকীর্ণতাকে যেমন, তেমনি তার উদারতাকেও সে একটা বৃহত্তর, অধিকতর অর্থবহ (অন্তত তার চোখে যা বৃহত্তর ও অধিকতর অর্থ-বহ) পারসপেকটিভ দান করে। আরও একটা বড়ো কাজ করে ধর্ম। ধর্মের যেসব আচার-নিয়ম সাদা চোখে অর্থহীন, এমন কি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়, সেসবও তাকে এক বৃহৎ জনমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করে, তার একাকিত্ববোধ থেকে তাকে মুক্তি দেয়।

এসব প্রয়োজন কি আর কিছুতে মেটাতে পারে না? সংগঠন, আন্দোলন তো আরও নানা রকমের হয়। অবশ্যই পারে, কিন্তু সে কত দিনের জন্যে? যেহেতু সেসবেরই লক্ষ্য সীমাবদ্ধ, তাই তার স্থায়িত্বও সীমিত। একমাত্র ধর্মই এমন কিছু লক্ষ্য মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে, যা কোনোদিন আয়ত্তে আসবারও নয়, আবার যা মিথ্যা, অলীক বলে পরিত্যাগ করাও চলে না। সে লক্ষ্য পরিত্যাগ করতে গেলে তার আকাঙ্ক্ষাটাও পরিত্যাগ করতে হয়। তার মানে নিজেকেই খর্ব করা।

তাহলে কোন্ পথ বাকি রইল? ধর্মের যত কলুষতা, যত আবিলতা, যত অমানবিকতা, সেসব কি মানুষের চির-সঙ্গী হয়ে থাকবে? যে ধর্ম হিংস্র, রক্তলোলুপ, তার হাত থেকে মানুষের কি মুক্তি নেই?

এ কথা মানা যায় না। মানুষের মধ্যে যে হীন প্রবৃত্তি-সমূহ রয়েছে, মানুষই তার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম, ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু ধর্ম-সংস্কারের পথে নয়, ধর্ম-সমন্বয়ের পথেও নয়। ধর্ম মানেই এমন শক্তি যা যুক্তি-তর্কের বাইরে। তাকে স্থনীতি আর সদাচারের বাঁধা সড়ক ধরে আমরা যুক্তিবাদীরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব, এ আশা ভ্রান্ত।

বরং অন্য দিক থেকে, সুস্থ, উদার মানবিকতা-বোধ-সম্পন্ন জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে, এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, আমোদপ্রমোদ, সামাজিক মেলামেশা, সর্বোপরি ঘনিষ্ঠতর পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসে, তার মন থেকে ধর্মীয় হিংসাদ্বেষের ভাব কমিয়ে আনতে হবে। আধুনিক জীবনযাত্রায় তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

অন্বেষণের শিল্পকর্ম

চিত্রভানু মজুমদারের একক চিত্রপ্রদর্শনী। বিভলা অকাদেমী। ২৭ অকটোবর-৮ নভেম্বর ১৯৮৭।

তারক গড়াইয়ের একক ভাস্কর্য ও চিত্রপ্রদর্শনী। বিভলা অকাদেমী। ১০-২২ নভেম্বর ১৯৮৭।

পেনটারস অরকেনট্রার ১৮শ বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী। অকাদেমী অব ফাইন আর্টস। ১৯-২৬ নভেম্বর ১৯৮৭।

আত্মপরিচয়ের সন্ধানই শিল্পে মূল চালিকাশক্তি। সময় আর সমাজ-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সত্য আবিষ্কার এবং আত্ম-আবিষ্কারের শিল্পনির্মাণের একান্ত চেষ্টা সব শিল্পীকেই করতে হয়। এর ফলে চিত্র-শিল্পীর সামনে থাকে দুটি সমস্যা : এক, প্রচলিত শিল্পধারার সীমাবদ্ধতা নির্ণয়, দুই, নতুন শিল্পভাষার উদ্ভাবন।

বলা বাহুল্য, চিত্রভানু মজুমদারের -ও মূল সমস্যা ওই দুটিই। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদারের পুত্র চিত্র-ভানুকে প্রাথমিকভাবে যেমন পিতার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হয়েছে, তেমনি খুঁজে নিতে হয়েছে নতুন চিত্রভাষা। আত্ম-আবিষ্কারের চিত্রনির্মাণে তিনি যেমন সচেষ্ট তেমনি উত্তীর্ণও।

এই প্রদর্শনীর ১৯টি তেলরঙ ছবির বিষয়বৈচিত্র্য মনকে নাড়া দেয়, মন-কেমন-করা এক বিষণ্ণতা চেপে ধরে। বর্তমান চিত্রশিল্পের বিষয় হল হয় বিক্ষোভ, না-হয় এক শুদ্ধ মরমি অনুভবের প্রকাশ। চিত্রভানুর এই ছবি-গুলিও বিক্ষোভের ছবি, তবে উগ্র নয়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে নান্দনিকভাবে তিনি বিক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন। জীবনকে নানাভাবে জীবনেরই সমস্ত উপাদান দিয়ে বিপন্নতাকে ধরতে চেয়েছেন। কোথাও প্রতীকে, কোথাও মুখের অভিব্যক্তিতে।

প্রদর্শনীর মুখপত্রে বলা হয়েছে Chitravanu's painting has always sought to move through tensions to balance : The fragmentation of form, deliberately disintegrated only to be re-built ; the interplay of rhythms of colour and line ; all coming to rest in a final resolution, a final harmony.—অথচ আমরা দেখলাম নিজস্ব শিল্পভাষা সন্ধান এবং

চিত্রকলা

আত্মপরিচয় স্থাপন ৪৯টি ছবির মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকলেও শিল্পী অস্থিরতা থেকে স্থিরতায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। প্রদর্শিত ছবিগুলির ঠিক মাঝখানে গোটা ক্যানভাস জুড়ে প্যাচার ছবিটি সমস্ত স্থিরতাকে তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে দেয়। ১, ২, ৩, ১২, ৩৭ সংখ্যক ছবিগুলি থেকেও ওই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। যেন মানুষ, মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ওই নিশাচর প্যাচার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর ঠোঁটের আওতায় পড়ে আছে। বিপন্ন, ফ্যাকাশে অস্থির ছবিগুলি দেখার শেষে ভয়ে-কাঁপা, মন-কেমন-করা হৃদয়, মন থমকে যায় ৪৬ সংখ্যক ছবিটির কাছে। সমস্ত টেনশনের শেষে একগুচ্ছ ফুল উপহার দেন চিত্রভানু। কালো পটভূমির উপর ক্রমে উজ্জ্বল পুষ্পগুচ্ছ মানুষের জয়যাত্রারই শুভেচ্ছাবার্তা বহন করছে। ছবিটির মূল ব্যঞ্জনা এবং ব্যালান্স দাঁড়িয়ে আছে টেনশনের উপরই।

তবু চিত্রভানু তাঁর সাম্প্রতিক কাজে সময়কে, সমাজ-প্রগতিকে স্পর্শ করতে পেরেছেন বলে মনে হল না। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বর্তমান ডামা-ডোল অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে বিষয়-গত শূন্যতায় ভুগছেন তিনিও আর দশজন শিল্পীর মতো। শুধু ফর্ম-চর্চার মধ্য দিয়ে যে ছবির মুক্তি নেই, একথাটা তো বার-বার শিল্পীরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। শিল্প-আন্দোলন ব্যাপারটা যদি নতুন উদ্ভূত সমস্যকে প্রকাশ করার মাধ্যম অন্বেষণ হয়, তাহলে দেখা যাবে একটা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার জঠরেই আরেকটা আন্দোলনের জন্মবীজ লুকিয়ে রয়েছে। বর্তমান চিত্রশিল্পে বিষয়গত শূন্যতা এবং প্রকাশমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা বড়োই প্রকট,—তাকে ফর্ম-চর্চার অভিনবত্বে ওড়ানো যাবে না। চিত্র-ভানু এই ভুলটাই করছেন মনে হয়। দেশকে সম্যকরূপে জানতে হবে, আরো সূক্ষ্মভাবে দেশের অতল-গভীর স্তর থেকে তুলে আনতে হবে বিষয়কে; সাংবাদিকের দৃষ্টিতে নয়, আত্মীয়তায়। চিত্রভানুর ছবিতে আত্ম-আবিষ্কারের পরিচয় রঙ-রেখায়। রঙের ব্যবহার আর মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশে তাঁর দক্ষতাকে শ্রদ্ধা করি। তবে এই ছবি-গুলি তাঁর প্রতিষ্ঠাপর্বের ছবি নয়, অন্বে-ষণের। সময়, সমকাল আর সমাজ-

প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে স্বদেশসন্ধানে তাঁকে আরো অনেক দূর যেতে হবে।

'বেঙ্গল স্কুল'-প্রভাবিত প্রাচ্যতার অনুসারী আদর্শায়িত সৌন্দর্যচেতনা এবং লোকায়ত রূপবন্ধে ধ্রুপদী সৌন্দর্য-চর্চার সঙ্গে পরিবারবোধ তারক গড়াইয়ের ভাস্কর্যের আর জলরঙ ছবির মূল লক্ষণ। ভারতীয় ভাস্কর্যের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে ভারতীয় ঘরানার (প্রচলিত) সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের মেলবন্ধন করা। এই সমস্যা তারক গড়াইয়ের ভাস্কর্যের মধ্যে আরো প্রকট। তারক গড়াই শান্তিনিকেতনের ছাত্র, তাঁর মধ্যে রামকিঙ্করের ছাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। বরং রামকিঙ্কর ভারতীয় ভাস্কর্যের যে দ্বার খুলে দিয়েছেন তাকে অনুসরণ করার মতো বলিষ্ঠ ভাস্করের অভাব। তারক গড়াই সেই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে কখনো-কখনো বেরিয়ে গেছেন। তিনি যখনই তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের পথ খুঁজতে গেছেন তখনই তাঁর দুর্বলতা খুজে পাওয়া যাচ্ছে। কাপ্‌ল্ (৬ নং) ভাস্কর্যটি (কাঠ) দেখলে খুব সহজেই রামকিঙ্করের সুজাতা মূর্তির কথা মনে পড়ে যায়। তারকবাবুর এই ভাস্কর্যটিকে ভালো লাগে, এখানে রাখঢাক নেই, বলিষ্ঠ টানটান একটি শ্রমজীবী মহিলা, যেন সুজাতাই গৃহস্থে ফিরে এসেছে সন্তান। কিন্তু প্রশ্ন, ওই মূর্তিটি এমন লম্বা হল কেন? সুজাতা মূর্তির পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে তার দীর্ঘাকার ছিল অনিবার্য। তারকবাবু কি জিয়াকোমেত্তির ভাস্কর্য থেকেও পথ সন্ধান করছেন? হবনব (২৫ নং), শেলটার, গণপতি সিরিজের ভাস্কর্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভার্জিন (৪ নং), শেলটার (১৪ নং), সঙ্গসট্রেস (১২নং) প্রভৃতি ভাস্কর্যগুলি খুবই সুন্দর। হবনব, ফ্যামলি, গণপতি (১ নং) ও সঙ্গসট্রেস—এই চারটি ভাস্কর্যের মধ্যে তারক গড়াইয়ের কৃতিত্বের স্পষ্টতা উজ্জ্বল।

তবে সামগ্রিক প্রদর্শনী থেকে তারক গড়াইয়ের স্পষ্ট কোনো পরিচয় উঠে আসে না। প্রদর্শিত ২৭খানা ভাস্কর্যের মধ্যে শান্তিনিকেতনী ঘরানার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাস্কর্যের এতই প্রভাব যে তারক গড়াইয়ের আত্মপরিচয় আবিষ্কার করা খুবই জটিল। তাঁর ভাস্কর্যের বিষয় প্রায় ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবন, কিংবা পরিবারসংলগ্ন জীবনযাত্রা। মা, বাবা, সন্তানসন্ততির মিলিত পারিবারিক জীবন, কোথাও পরিবারের সংহতি আর দৃঢ়তাকে মূর্তি দিয়েছেন (৩ নং)। তাঁর এই ভাস্কর্যগুলিতে এক নসটালজিয়া কাজ করছে, ক্রমেই কৃত্রিম পোশাকি জীবনযাত্রায় হারিয়ে-যাওয়া জীবনের মূল সন্ধানের চেষ্টাই সর্বত্র। অভাব, অনটন, ভাঙা মূল্যবোধ আর তার পাশাপাশি পরিবারের আরকিটাইপ তারক গড়াইয়ের ভাস্কর্যের মূলে।

জলরঙ ছবিগুলির ক্ষেত্রেও সেই কথা। এখানেও বারে-বারে মা-ছেলের কথা এসেছে। উলঙ্গ মানব-মানবীর মধ্যে পরিবারের আরকিটাইপ সন্ধানের চেষ্টা স্পষ্ট। তবে ভাস্কর্যের মধ্যে যদি-বা কোথাও স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন, পেনটিংসের মধ্যে শান্তিনিকেতনী প্রভাবকে একেবারেই কাটাতে পারেন নি। যে-যে ছবির ফিগারগুলি ভাস্কর্যের আদলে আঁকা, সেখানে তাঁর স্বকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়।

তারক গড়াইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ সরল। পারিবারিক জীবনকে উপর-উপর সৌন্দর্যের চোখে দেখেছেন, যে দেখা শিল্পীর দেখা হতে পারে না। জীবন এত সহজ-সরল বাঁধা পথে চলে না। জীবনের প্রায় সমগ্রতাকে গ্রাস করে আছে জটিলতা। তবে তিনি যে মূলত ভাস্কর পেন্টিংসের কাজগুলি থেকে সেই কথাই উঠে আসে।

সংঘবদ্ধ শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি একান্ত জরুরি যে তাঁরা গতবারের থেকে কতটা এগিয়েছেন, কিংবা কতটা বিশিষ্ট হতে পেরেছেন। আমাদের দেশে চিত্রশিল্পীদের সংঘবদ্ধতার সফল তিনটি গ্রুপ (ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আর্ট, ক্যালকাটা গ্রুপ ও সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আরটিস্ট) নব-উদ্ভূত সামাজিক-সমস্যা রূপায়ণে শিল্পভাষার অভাবের শূন্যতাকে পূর্ণ করেছিল। এখন তেমন কোনো বড়ো রকমের শিল্পীসংঘ গড়ে না উঠলেও একান্ত পরিচিত বন্ধুদের এক জায়গায় এনে, যৌথভাবে প্রদর্শনী করে, আর্থিক দায়-দায়িত্ব বণ্টন করে গড়ে তুলছেন ছোটো-ছোটো শিল্পীগোষ্ঠী। 'পেনটারস অরকেসট্রা' আট জনের তেমনি একটি শিল্পীসংঘ।

'পেনটারস অরকেসট্রা'র অষ্টাদশ বার্ষিক প্রদর্শনী দেখে যে প্রশ্নটা খুবই বড়ো হয়ে ওঠে, তা হল, এই গ্রুপের শিল্পীরা ঠিক কিসের সন্ধানে রয়েছেন? আমরা জানি শিল্পীকে ফরম্-চর্চার মধ্য দিয়েই বিষয়ের গভীরতায় পৌছোতে হয়। এই গ্রুপের শিল্পীরা অষ্টাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে পৌছেও এখনও ফরম্-চর্চার প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। চিন্ময় রায়, শান্তনু ভট্টাচার্য, শুচিব্রত দেব, জহর দাশগুপ্ত, পার্থপ্রতিম দেব ও তপন মিত্রের বয়স চল্লিশ ডিঙিয়ে, না-হয় চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই; সবাই শান্তিনিকেতনের ছাত্র। অরুণ মজুমদার, বিরাজ পাল ত্রিশোর্ধ্ব বয়সের, রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র। সংঘের বয়স এবং শিল্পীদের বয়স পরিণতির সীমায় পৌছে গেলেও শিল্পীরা যতটা অগ্রগতি ঘটিয়েছেন তারও চেয়ে বেশি ঘটেছে বৃত্তাকারে ভ্রমণ। বিরাজ পাল ছবির মধ্যযুগে পড়ে আছেন। রঙের ব্যবহার ও চিত্রণের দক্ষতা ভালো, ভাবনার গণ্ডি খুবই সীমিত। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ছবির গণ্ডি কাটিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষ এবং সমকালীন চিত্রধারা আয়ত্ত না করলে, বিষয় ছাড়িয়ে বিষয়ের গভীরে না গেলে তাঁর ছবি বিশিষ্ট হয়ে উঠবে না কখনোই। জহর দাশগুপ্তের ছবির হাতটি পাকা, কিন্তু বিষয় বড্ডো ফিকে। 'ফর এ ব্রাইট টুমরো' (২০) ছবিটি ভালো লেগেছে। শান্তনু ভট্টাচার্যের লিনোকাট ভালো। অরূপ মজুমদারের জলরঙ ছবিগুলি অপূর্ব। ছোট্ট আয়তনে মাঠ, বন, পাহাড় পুরো অবয়ব নিয়ে এসেছে। রঙ দৃষ্টিকে অনেকদূর অব্দি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। তবে তাঁর ছবিতে চিত্রণের দক্ষতা ছাড়া আর কিছু নেই।

চিন্ময় পেনটারস্ অরকেসট্রার একমাত্র শক্তিশালী শিল্পী। ছখানা তেলরঙ ছবিতেই তাঁর শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। দেশজ উপাদান আর পাশ্চাত্য মননের চর্চা একযোগে তাঁর ছবিতে সদর্থক প্রশান্তির পরিমণ্ডল এবং ধ্রুপদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। "রিদম" (২) ছবিটি অপূর্ব। একতারার তার নেই অথচ তারই সুরে কেঁপে-কেঁপে পড়ছে গাছের পাতা। সার-সার নোঙর করা ফাঁকা নৌকার শূন্যতায়ও তারহীন একতারার ছন্দ (ভ্যাকান্ট্)। জীবনের শূন্যতাকে যে সব সময় কালো দিয়েই আঁকতে হবে, তার কোনো মানে নেই। চিন্ময়ের এই ছবিগুলিতে জীবনের শূন্যতারই সন্ধান—অথচ মালিন্য নেই। চিন্ময়ের লক্ষ্য স্থির, এবার লক্ষ্যভেদের পালা। আমরা তাঁর পরবর্তী সৃষ্টি দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।

তবে সামগ্রিকভাবে পেনটারস্ অরকেসট্রার অষ্টাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীর ৪৬টি ছবি কোনো ছাপ রাখতে পারে নি। কোনো নির্দিষ্ট আন্দোলন বা বিশিষ্ট কোনো লক্ষণও উঠে আসে না শেষ পর্যন্ত। শিল্পীদেরও যৌথ পরিকল্পনার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন চর্চার প্রবণতা বেশি। বলা বাহুল্য, তরুণ শিল্পীদের এই প্রদর্শনী দেখে উৎসাহিত হওয়ার বদলে হতাশ হয়েছি।

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

দেবশিশু

অভিজিৎ করগুপ্ত

পশ্চিমবাঙলা এবং বিহারের সীমান্তবর্তী এক গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি সাইকেল রিকশা—সর্বাঙ্গে রঙিন পোস্টার। পোস্টারে আঁকা তিনমাথা-চার-পা-ওয়ালা এক অদ্ভুত মানবশিশুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে না হতেই চমক ভাঙে মাইকে ভেসে আসা আরোহীর প্রবল চিৎকারে। আমরা অবহিত হই ওই বিচিত্র দেহের অধিকারী শিশুটির অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে ;—মনুষ্যকুলে জন্মেও সে নাকি 'দেবশিশু'। মাত্র উনিশ পয়সার টিকিট কেটে এই দেব-শিশুকে দর্শন করলে, তার কাছে মানত করলে, কোনো মনস্কামনাই অপূর্ণ থাকে না। ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই চলমান রিকশার পশ্চাতে ধাবিত হয় বেশ কিছু গ্রাম্য মানুষ, এবং ক্যামেরা। হঠাৎই ফ্রেমে ঢোকে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, এক যুবতী বধূ আর দুটি ছেলেমেয়ে। এরা এক দেহাতি দম্পতি—রঘুবর আর সীতা ; ছেলেমেয়ে দুটি ওদেরই সন্তান। দেবশিশুর প্রচার-রিকশা দেখে ওরা অবাক হয়। ওদের বিস্মিত অভিব্যক্তির উপর ক্ষণিক দাঁড়িয়েই অভিমুখ বদল করে ক্যামেরা। প্রচার-রিকশা ধীরে-ধীরে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়, ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে ঘোষকের কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে রঘুবর আর সীতা আবার হাঁটতে শুরু করে। ক্যামেরাও পিছু নেয় ওদের।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তৃতীয় কাহিনীচিত্র এবং সপ্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত "দেবশিশু"র প্রারম্ভিক দৃশ্যই দর্শককে উদ্মুখ করে তোলে এক ব্যাপকতর প্রত্যাশার প্রতি। ছবি শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই উৎপলেন্দুর আঙ্গিক প্রায় চুম্বকের মতো আমাদের চেতনাকে টেনে নেয় বিষয়বস্তুর দিকে। অন্তিম দৃশ্যেও পুনরাবির্ভাব ঘটে দেবশিশুর প্রচার-রিকশা। একই ভঙ্গিতে, দেবশিশুর মাহাত্ম্য প্রচার করতে-করতে, প্রশস্ত সড়ক বেয়ে, এগিয়ে যায় সাইকেল রিকশা আর তার আরোহী। মধ্যবর্তী দুটি ঘণ্টা ধরে পরদার বুকে সংঘটিত হয় একটি ব্যবচ্ছেদপ্রক্রিয়া। সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরাকে ছুরি-কাঁচির সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, এ এক প্রশংসনীয় ময়নাতদন্ত। ভারতীয় সমাজ-জীবনের একটি অনাবৃত অবয়বের সামনে দাঁড়িয়ে, এদেশের প্রায় প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে-থাকা এক অতিপরিচিত এবং দুর্দান্ত কীটের মুখোমুখি হয়ে কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও সংকুচিত, কখনও বা আঁতকে উঠি আমরা। আর তারপর ওই অন্তিম দৃশ্যের ব্যঞ্জনা অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাঙলা সাহিত্যের একটি অতি পরিচিত বাক্যকে : 'সেই ট্র্যাজিশন সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।'

একদিকে বন্যায় সর্বস্বান্ত, বিপর্যস্ত রঘুবর আর সীতার বেঁচে থাকার লড়াই, অন্যদিকে তাদেরই বিকলাঙ্গ সন্তানকে নিয়ে নির্লজ্জ বেদাতি ; একদিকে জোজুবুরি আর ভণ্ডামি, আর অন্যদিকে দারিদ্র্য, অনাহার এবং সর্বাত্মক অজ্ঞতা—এ দুয়ের সমাহারেই তৈরি হয়েছে 'দেবশিশু'র কাহিনী। জন্মরাত্রিতেই সামাজিক অপবাদের ভয়ে যে শিশু পরিত্যক্ত হয়েছিল, আজ তাকে ভাঙিয়েই—হাজার-হাজার টাকা আয় করছে এক ভণ্ড জাদুকর। শিশুটির বিকলাঙ্গ এবং বিকৃত শারীরিক গঠনের উপর, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক কারণে, দেবত্ব আরোপ করে, গড়ে উঠেছে একটি ছদ্মচক্র। এদেশের জমিতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের ব্যাবসা রাতারাতি প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হাজার-

সিনেমা

হাজার মানুষ প্রায় উন্মাদের মতো ছুটে যাচ্ছে দেবশিশুর আশীর্বাদ পাবার প্রত্যাশায়—এ দৃশ্য দেখতে-দেখতে পরদাকে দর্পণ বলে মনে হতে থাকে।

রঘুবরও এসেছিল 'দেবশিশু'দর্শনে। ভাগ্যবিপর্যয়ের পর নিরাহ গ্রাম্য মানুষটি আজ আত্মীয়ের গৃহে ভৃত্যের জীবনযাপন করার গ্লানিতে জর্জরিত। শ্যালকজায়ার আদেশে সে বেরিয়েছিল গম কিনতে। বেরোবার মুহূর্তেই তার অসহায়, অক্ষম পিতৃত্বকে দলিত করেছে একটি অসহ-নীয় দৃশ্য—থালের ধারে তারই শিশুপুত্র কেচে চলেছে রাশী-কৃত কাপড়। ফেরার পথে আশীর্বাদ পাবার আশায় সে দেব-শিশুদর্শনের সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়ায় ; উনিশ পয়সার টিকিট কেটে তাবুতে ঢোকে। ভিতরে এসেই রঘুবর চমকে ওঠে। কোথায় দেবশিশু।—এ তো তারই ঔরসজাত সন্তান ! আর ওই সাধুও তো তার পরিচিত ! গেরুয়া পোশাকের আড়ালে থাকলেও গ্রামের তান্ত্রিক হনুমান ওস্তার জামাই জাদুকর প্রসাদজীকে চিনতে রঘুবরের কোনো ভুল হয় না। এই হনুমান ওস্তা আর প্রসাদজীই অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে,

মাত্র তিরিশ টাকার বিনিময়ে, কিনে নিয়েছিল ওই বিকলাঙ্গ শিশুকে। এখন সেই শিশুই এই ব্যাবসার প্রধান পুঁজি। স্বভাবতই অনুশোচনা বা দুঃখের বদলে ওই মুহূর্তে রঘুবরের মনে জেগে ওঠে লভ্যাংশ পাবার ইচ্ছে।

প্রসাদজীর দিক থেকে এ দাবি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়। এই লোভনীয় ব্যাবসার পথের কাঁটাকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে সে একটুও দেরি করে না। মার খেয়ে, রক্তাক্ত হয়ে ক্রোধ আর ক্ষোভ নিয়ে ফিরে আসে রঘুবর। রাতের অন্ধকারে শ্যালকের গোয়ালঘরে ফিরে আসে মানুষটা। দুটি অবোধ শিশুকে নিয়ে সেখানে তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে সীতা। এই সময়ই আমরা আর-একটি অনবদ্য দ্যোতনার সম্মুখীন হই। ঘরে ফিরেই রঘুবরের বুকভরা হাহাকার প্রকাশ পায় এক বিকৃত অভি-লাষের মধ্য দিয়ে। আর একটি বিকলাঙ্গ শিশুর দাবি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীতার উপর। সীতা প্রতিবাদ করে, কটাক্ষ করে, আক্রমণ করে রঘুবরের কাপুরুষতাকে। এরপর দুজনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। ক্রন্দনরত অবস্থাতেই ধীরে-ধীরে দুটি ক্লান্ত শরীর এলিয়ে পড়ে বিছানায়। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের আগে সীতার চোখ যায় দেওয়ালে টাঙানো ছেঁড়া ক্যালেনডারের কালীমূর্তির দিকে। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে সে নিজেই কালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সীতা স্বপ্ন দেখে—প্রসাদজী আর তার দল-বলকে সে খড়্গ হাতে তাড়া করছে ; অবশেষে প্রসাদ-জীকে সীতা খড়্গাঘাত করে এবং তৎক্ষণাৎ তার স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যায়। ভোরের নরম আলো তখন আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। জাগ্রত সীতা বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। বাড়ির সীমানায় কাঁটাতারের বেড়ার খুঁটি ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সাউনডট্রাকে ভেসে আসে ভোরের প্রথম ট্রেনের হু হু শব্দ। তারপর আবার পরদার বুকে ফুটে ওঠে দেবশিশুর প্রচার-রিকশার সঙ্গে মাইকের স্বতীব্র ঘোষণা।

দেবশিশুর চলচ্চিত্রমূল্যকে বিশিষ্টতা দান করার পিছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা এর কাহিনী এবং চিত্রনাট্যর। প্রশংসনীয় ট্রীটমেনট এবং কিছু অসাধারণ কমপোজিশনও এ ছবির ক্ষেত্রে সম্পদ হয়ে উঠেছে। উৎপলেন্দুর বক্তব্যের প্রতিটি অণুপরমাণুর গভীরতা সম্পর্কে সজাগ থেকেছে ক্যামেরা। আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায়ের দক্ষতা তর্কাতীত। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যকেই অর্থগভীর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করতে আলো আর আবহসংগীত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সুপরিকল্পিত ছন্দে। মেক-আপ ও রঙ ব্যবহারও নিখুঁত। স্মিতা পাতিল, সাধু মেহের, শ্যামানন্দ জালান, ওম পুরী, রোহিণী হাত্তাঙ্গাদী এবং সুশান্ত সান্যালের অভিনয় যেন 'দেবশিশু' ছবির এক-একটি অলংকার। তথাপি সবকিছুকে অতিক্রম করে এক বিশাল বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছেন স্মিতা পাতিল। দেবশিশুতে স্মিতার অভিনয় নিয়ে একটি পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। ভ্রাতৃ-বধূর অনুপস্থিতিতে দুধ চুরি করে শিশুপুত্রকে খাওয়ানোর দৃশ্যে আমরা দেখলাম কী অসাধারণ পদ-সঞ্চালন, কী অমানুষিক আশঙ্কা এবং আকাঙ্ক্ষা যুগপৎ প্রকাশ পেল স্মিতার মুখমণ্ডলে। ওই মুহূর্তে ওঁর কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ দেখে অবাক হতে হয়।

এবার তাকানো যাক 'দেবশিশু'র সর্বাঙ্গীণ আবেদনের দিকে। 'দেবশিশু' নিঃসন্দেহে এক যুগোপযোগী প্রয়াস, এবং অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু একেবারেই ত্রুটিহীন নয়। এ ছবির সীমাবদ্ধতার মূল নিহিত আছে পরিচালকের দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যেই। সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতাকে পাশাপাশি রেখেই বিশ্লেষণ করা যাক এই উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রসৃষ্টিকে। দেবশিশুতে তিনমাথার মানবশিশুটির প্রতি অগণিত মানুষের ভক্তি-উচ্ছ্বাস এবং দেবত্ব আরোপ নিয়ে কোনো জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে পা বাড়ান নি উৎপলেন্দু। রঘুবরের বিকলাঙ্গ শিশুটিকে দেবতাপ্রেরিত মুশকিল আসানের প্রতিভূ বানিয়ে পয়সা লোটার চেষ্টা এদেশের ধর্মীয় নগ্নতার ক্ষেত্রে কোনো নতুন মাত্রার যোগ করে না। ভারতবর্ষের লক্ষ-লক্ষ গ্রামে, মফস্সলে, গঞ্জে এমনকি সভ্যতার প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত মহানগরীগুলিতেও এই ধরনের ব্যাবসা উৎকটভাবে বেড়ে চলেছে। ধর্ম ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রাচীনতম অন্ধবদ্ধগুলির একটি। এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব সুস্পষ্ট। সত্তর কোটি মানুষের দেশে এই আফিমিটর বিকাশ এবং ব্যাপ্তির সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন হল অজ্ঞতা এবং অশিক্ষা। উৎপলেন্দু প্রসঙ্গটির কোনো সমাজমনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বসেন নি বলেই প্রশ্ন আসে, 'ধর্ম' নিয়ে বেসাতির চিত্রায়নে উনি যতটা উদ্‌গ্রীব, যতটা ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ নিয়ে উনি ছিঁড়ে ফেলতে চান প্রসাদজী আর তার গুরু এবং অন্ধচরদের ভণ্ডামির মুখোশকে, ঠিক সমপরিমাণ আগ্রহ কেন দেখি না দুঃস্থ

মানুষগুলির মূঢ়তাকে তুলে ধরতে। প্রসাদজীর অনুচরদের হাতে মার এবং তাড়া খেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন রঘুবর এসে ভেঙে পড়ে কালীমূর্তির সামনে। আর শেষ দৃশ্যে সীতা কালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ দুটি দৃশ্যেই এই বিরাট প্রশ্নটির সামনে আনা যেত দর্শককে। অথচ আশ্চর্য, পরিচালক দুটি ক্ষেত্রেই বক্তব্যের অভিমুখকে নিয়ন্ত্রিত করলেন এক ভিন্ন কায়দায়। প্রথমটি অর্থাৎ কালীমূর্তির সামনে ক্রন্দনরত রঘুবরের অনুযোগ প্রকাশ এ ছবির অন্যতম দুর্বল মুহূর্ত। বেদনা গ্লানি আর হতাশায় আক্রান্ত একটা মানুষের প্রতি সমবেদনা ছাড়া আর কিছু অনুভূত হয় না—এ তো যে-কোনো সস্তা বাজারি ছবিও পারে। তাহলে এই দৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? রঘুবর চরিত্রের আচরণে আমরা কোনো উত্তরণ দেখি না। হয়তো এক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক—জীবনযুদ্ধের প্রতিটি জমিতে বিধ্বস্ত হয়েও সে এখনও ধর্মনামক অকটোপাসের হাত থেকে নিস্তার পায় নি। কালীমূর্তির সামনে তার আচরণ এই মূঢ়তাকেই চিহ্নিত করে—কারণ তা না করে উপায় নেই। কিন্তু পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ওই বিশেষ ফ্রেমটির নিজস্ব ভাষা এক দুর্বোধ্য কারণে কোনো সমীকরণ টানতে পারে না। আর ঠিক সেই কারণেই দৃশ্যটি অসাধারণ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হওয়ার পরিবর্তে এক অতিসাধারণ মামুলি ফ্রেমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সীতার স্বপ্নদৃশ্য এবং তার পরবর্তী অংশটি আরো বেশি জটিল। এই পর্যায়ে উৎপলেন্দুর ট্রীটমেন্ট শিল্পের বিচারে যতটা নান্দনিক এবং সমৃদ্ধ, বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ততটাই অস্বচ্ছ। ওইরকম একটা দুর্ধর্ষ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর সীতার রক্তে প্রতিশোধস্পৃহার বদলে কেন হতাশার আগমন? অথচ স্বপ্ন দেখার আগে এই সীতাই তো স্বামীর অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করেছিল। বঞ্চনা এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভিলাষ কি তাহলে স্বপ্নই থেকে যাবে? আসলে ভারতীয় প্রতিবাদী চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় 'প্রতিবাদ'-এর ধারণাটা কিছুতেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। 'দেবশিশু'তে এর ব্যতিক্রম ঘটলে খুশি হতাম, কারণ বহুদিন পরে এই ছবিতেই আমরা ভারতীয় সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য ক্ষেত্রকে যথার্থ সততার সঙ্গে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করলাম। 'ময়না তদন্ত' এবং 'চোখে'র পরিচালকের জীবনেও এ এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

অন্যান্য বহু দৃশ্যের কথা মনে পড়লেও সবকটিকে নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবুও 'দেবশিশু'কে দেখবার জন্য হাজার-হাজার মানুষের লাইন এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মিছিলের কথা না উল্লেখ করলে অন্যায় হবে। এই দৃশ্যে ছোটো-ছোটো ফ্রেমের সাহায্যে, অসাধারণ দক্ষতায়, উৎপলেন্দু সৃষ্টি করেছেন কিছু অনবদ্য ভিজ্যুয়াল এফেক্ট। এ ছাড়াও আছে কিছু কনট্রাস্ট সিকোয়েন্স। বিভিন্ন সময়ে দুটি ভিন্নধর্মী দৃশ্যকে একই বা পরপর দুটি ফ্রেমে টেনে এনে পরদার বুকে যে ডায়ালেকটিকাল এফেক্ট উনি তৈরি করেছেন তাতে পরিচালক হিসেবে ওঁর দক্ষতা সম্পর্কে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রথম দৃশ্যেই এই ডায়ালেকটিকাল এফেক্ট আমাদের নাড়া দেয়। অপর দুটি ক্ষেত্রে এই ধরনের বিপরীতধর্মী বাস্তবতার যুগ্ম উপস্থাপনা অনবদ্য সিনেম্যাটিক সপ্রতিভতায় সংপৃক্ত। দৃশ্য দুটির অবতারণা করা যাক। প্রথমটি দুটি শুরু হবার কিছুক্ষণ পরেই। বিপর্যস্ত চারটি প্রাণী প্রায় প্রাগৈতিহাসিক নীরবতা নিয়ে প্রবেশ করছে সীতার দাদার বাড়িতে। অন্যদিকে সেই মুহূর্তেই সে বাড়িতে বয়ে চলেছে ভজনগানের উচ্চকিত উচ্ছ্বাস। ছোটো-ছোটো জাম্প কাট; একবার ভজন গায়কের ক্লোজ শট, সঙ্গে সংগীতের স্বর আর সুর, পরমুহূর্তেই সীতা, রঘুবর ও দুটি অবোধ শিশুর নির্বাক এবং স্থির অভিব্যক্তি। এ এক অসাধারণ দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা। দৃশ্যটি হয়তো কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। কিন্তু ট্রীটমেন্ট এত সাবলীল যে মুহূর্তের জন্যও বিরক্তি আসে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি তুলনায় বেশি চমকপ্রদ হলেও অবশ্যই কিছুটা গিমিকধর্মী। প্রসাদজীর অনুচরদের হাতে নিগৃহীত রঘুবরের হাত থেকে ছিটকে যায় গমের থলি। একদিকে আক্রান্ত রঘুবর প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে, অন্যদিকে একটি ক্ষুধাক্লিষ্ট গ্রাম্য তরুণী, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, প্রায় চোরের মতো মুঠোভরে তুলে নিচ্ছে মাটিতে ছড়ানো একরাশ গম। একই সিকোয়েন্সে পর-পর কয়েকটি ফ্রেমে এ ধরনের বিপরীতধর্মী দৃশ্য দেখে আমাদের অনুভূতি একটু থমকে দাঁড়ায়। অনাহার না শোষণ—কোন্‌টি বেশি প্রাচীন; এ দেশের জমিতে, এ দুটির কোন্‌টির শিকড় অধিকতর গভীরে প্রোথিত—এই দ্বিমুখী চিন্তার যন্ত্রণায় আমরা ক্লান্ত বোধ করি।

'দেবশিশু'তে ব্যবহৃত দুটি ফ্ল্যাশব্যাকই ছবির অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ। বন্যাদৃশ্যের দৈর্ঘ্য বেশ পীড়াদায়ক এবং বোরিং। রঘুবর, সীতা এবং কয়েকশ মানুষের বিপর্যয়ের বর্ণহীন দৃশ্যায়ন সুপরিকল্পিত হলেও

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হবার সময় বন্দুকের গর্জন কিছুটা হাস্যকর। দৃশ্যটি ছবির পরবর্তী সিকোয়েন্সে ফিরে আসার সংকেত ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। দ্বিতীয় ফ্ল্যাশব্যাকের একমাত্র সম্পদ হনুমান ওঝা ও তাঁর জামাই প্রসাদজীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি। এই দৃশ্যের সংলাপ 'দেবশিশু' ছবির বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

'দেবশিশু'তে উৎপলেন্দুর ট্রীটমেনটও আলোচনার যোগ্য। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে একটা নির্মম বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েও পরিচালক এক মুহূর্তের জন্যও দর্শককে অত্যধিক ইন্‌ভলভড বা আপ্লুত হতে দেন নি। এদেশের চলচ্চিত্রে বিশেষ করে কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াস খুব বেশি চোখে পড়ে না। উৎপলেন্দুর ট্রীটমেনটের সর্বাঙ্গে লেপটে আছে এক ধরনের ডকুমেনটেশনের আমেজ। অ্যাপ্রোচটি এক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক বা সফল, সে তর্কে না গিয়েও বলা যায়, কাহিনীর মতো দেবশিশুর ট্রীটমেনটেও নতুনত্ব আছে। আবহসংগীত এবং ডিটেল নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। দুটি ক্ষেত্রই পরিচালকের মননশীলতার পরিচায়ক।

শোষণ, নিপীড়ন, ব্যাপক গণহত্যা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ—এ সবই আমরা সেলুলয়েডের বুকে দেখেছি—দেখেছি ভারতীয় পরিচালকদের নির্মিত ছবিতেই; কিন্তু ধর্মের নামে শোষণ আর জোচ্চুরির যে রূপ আমরা দেবশিশুতে চিত্রায়িত হতে দেখলাম তা খুব বেশি চোখে পড়ে না—অন্তত এদেশের সিনেমায়। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রেক্ষাপট নির্বাচন এবং কাহিনী-বিন্যাসের এই অভিনবত্বের জন্যই দেবশিশু আমাদের চমৎকৃত করে। এই ভিন্নধর্মী প্রয়াসের জন্যই পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী বাহবা পেতে পারেন। সন্দেহ নেই এই রূপ কানোয়ারের দেশে 'দেবশিশু'-র মতো ছবি আজও প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

প্রখ্যাত গণসংগীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই বছরের ২২ নভেম্বর চলে গেলেন। যে কণ্ঠ এক গভীর দ্যোতনা সৃষ্টি করে আমাদের মনপ্রাণকে উদ্ভাসিত আলোড়িত করে তুলত, সেই অদ্ভুত কারুকার্যময় কণ্ঠের নির্ভীক গান আর আমরা শুনতে পাব না। তাঁর গান তীক্ষ্ণ, সতেজ, প্রাণময় করে তুলত আমাদের মেধাকে, প্রজ্ঞাকে।

শিল্পীর জন্ম হয়েছিল শ্রীহট্টের মিরাশী গ্রামে, ১৯২২ সালের ১৪ ডিসেম্বরে। ছাত্রজীবনেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়েন, বন্দী হন ১৯৩৫ সালে। বন্দী অবস্থায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পাওয়ার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে তিনি ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘে যোগ দেন, তার অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠেন। যাঁরা গভীর বিশ্বাস আর প্রাণান্তিক শ্রম দিয়ে অসম গণ-নাট্য সংঘ গড়ে তোলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন তাঁদের একজন। এই কাজে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন জ্যোতি-প্রসাদ আগরওয়াল। রাজস্থানের এই উদারচিত্ত মানুষটি আসামকে আপন করে নিয়েছিলেন, তার প্রাণের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। ১৯৫৭ সালে লেখা তাঁর একটি কবিতায় এই শ্রদ্ধা-ভালোবাসা প্রমূর্ত :

> ধূসর রাজপুতানার মরুভূমি থেকে
> নিক্ষিপ্ত একটি মাটির ঢেলা
> অনেক উপকথা, অনেক গাথা বুকে নিয়ে
> কী অনন্ত তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরছিল।
>
> শ্যামল আসামের
> কোমল মেঘের চুমোয়
> যে মাটির কন্যা জেগে উঠল,
> তারই গর্ভে জন্ম নিলে তুমি,
> বৃষ্টির ধারায় রূপ নিল
> কী অফুরন্ত সৃষ্টির ফোয়ারা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সমগ্র জীবনটাই ছিল ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত। এই আন্দোলনের প্রতিটি ঘাতপ্রতিঘাত টানাপোড়েন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন—তাঁর দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনকে এই আন্দোলন থেকে পৃথক করে ভাবা যায় না। তিনি নিজেও কোনোদিন ভাবেন নি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারার সঙ্গে গভীর বোধ আর প্রত্যয় নিয়ে জড়িত।

পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে, এবং তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যে মতাদর্শের সংগ্রাম শুরু হয়, সেই সংগ্রামে তিনি সে দিন ছিলেন বামধারার সঙ্গে। এই সময়ে "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করতেন তিনি। কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর মতপার্থক্য তিনি গোপন রাখেন নি—এবং নিজের বিশ্বাসের প্রতি অনুগত থেকে সে কাজ ছেড়ে তিনি চলে আসেন।

সত্তরের দশক ভারতের তরুণসমাজের কাছে ছিল "মুক্তির দশক"। পশ্চিম বাঙলার আরো অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর মতো নিরাসক্ত মন নিয়ে এই দশককে তিনি দেখেন নি। বরং, এই সময়ের যতটুকু ছিল সত্যনিষ্ঠ এবং আদর্শদীপ্ত, তাঁর অভিজ্ঞ বিচারবুদ্ধি দিয়ে সেইটুকুকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। করেছিলেন বলেই এই দশকের তরুণ-

স্মরণে

দের কাছে তিনি পেয়েছিলেন ভালোবাসা—হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন।

এই দশকেই তিনি স্বনামে বেনামে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। নিজের বিশ্বাস স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে একটুও সংকোচ করেন নি তিনি। এই সময়ে মোহন মুর্মু নামে "অনীক"-এ যেসব প্রবন্ধ তিনি লেখেন, সেগুলি মূল্যবান। বলা যেতে পারে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সংগ্রামের একটি দৃষ্টি-কোণ তুলে ধরার চেষ্টা তিনি করেন। তাতে বামপন্থী মহলে বেশ আলোড়ন ওঠে। পুরাতনপন্থীরা উষ্মা প্রকাশ করেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস অবিচলিত থাকেন নিজের বিচারে।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকে তিনি ত্রৈমাসিক "অন্বেষ্টুপ" পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী লিখছিলেন। মাত্র তিনটি কিস্তিই লিখতে পেরেছিলেন। তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে সেই সময়, আর সেই সময়ের হাতে গড়ে-পিটে-ওঠা মানুষ হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

পঞ্চাশের দশকে তিনি চিকিৎসার জন্য চীনে যান। বিপ্লবোত্তর চীনকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার, বোঝার সুযোগ তাঁর ঘটে। মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব

একটি অনুন্নত দেশের কোটি-কোটি হতদরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছিল, সেই আবেগ হেমাঙ্গ বিশ্বাসকেও নতুন উৎসাহে উচ্ছল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনার গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়।

চীনের লোকসংগীতকে তিনি নিজের মতো করে আত্মস্থ করেন। তার সুর ভেঙে-ভেঙে নতুন-নতুন সুরের ঝংকার তোলেন; অসমিয়া আর বাঙলা লোকসংগীতের সঙ্গে মিলে গিয়ে, তাঁর কণ্ঠের অত্যাশ্চর্য লাবণ্যে সেসব গান মোহনীয় হয়ে ওঠে—শ্রোতার মনে সৃষ্টি করে জ্বালা, বেদনা, অভীপ্সা।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, যে শিল্পী 'মাউনব্যাটেন-মঙ্গল-কাব্য', 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ', 'বাঁচব, বাঁচব রে আমরা', 'সেলাম চাচা, আমি যে দেখেছি সেই দেশ', 'শঙ্খচিল'-এর মতো গানের স্রষ্টা—যে গানগুলি সংগ্রামের মর্মস্থল থেকে উদ্ভূত—তাঁকে আমরা পল রোবসন, সিট সিগার, বব ডিলান, জন বারজের পাশে স্থান দিই না কেন? আমাদের মনের দীনতার জন্য? পিছিয়ে-থাকা দেশের মানুষ বলে?

কমলেশ সেন

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গ্রন্থ : (১) শঙ্খচিলের গান (স্বরলিপি-সহ), (২) হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান, (৩) সীমান্তপ্রহরী (কবিতা-সংকলন), (৪) অসমিয়া কবিতাসংকলন কুলথোরার চোতাল। (৫) চীন দেখে এলাম। (৬) আবার চীন দেখে এলাম। দুটি ক্যাসেটও প্রকাশিত।

মাত্র তিন মাস আগে "চতুরঙ্গ"-র অগস্ট ১৯৮৭ সংখ্যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং গণসংগীত, আই-পি-টি-এ থেকে আরম্ভ করে নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মতামত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্ভবত এইটিই ছিল শিল্পীর সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাৎকার।
এই সংখ্যার খানকয়েক কপি এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

নাট্যকার কমলকুমার মজুমদার

চতুরঙ্গের সেপটেমবর ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "নাট্যকার কমলকুমার মজুমদার" প্রবন্ধটিতে লেখক হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমার-প্রযোজিত এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত নাটকগুলির যে সময়ানুক্রম নির্ণয় করেছেন, তারই তথ্যগত প্রামাণিক সত্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিনয়পূর্বক নাট্যকার-পরিচালিত এবং তাঁর দ্বারা প্রযোজিত কিছু-কিছু নাটকের অভিনীত হওয়ার সংবাদ কারোরই কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কমলকুমারের নাট্যপরিচালনা এবং প্রযোজনা সম্পর্কে তিনি যে-সব অভিজ্ঞ মহল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরাও এ সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানাতে পারেন নি। সুতরাং লেখকের সংগৃহীত তথ্যের বাইরেও কমলকুমার-কৃত কিছু-কিছু নাট্যপরিচালনা রয়ে গেছে, যার পুনরুদ্ধার সম্ভব হলে অনেক নাট্যপিপাসু মানুষই লাভবান হতেন। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়তো সংগত মনে করি, যতদূর স্মরণ হয়, ১৯৫২ এবং ১৯৬৭ সালের মধ্যেও ১৯৫৩-৫৪ সালে কমলকুমার-পরিচালিত সুকুমার রায়ের "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকটি আর-একবার অভিনীত হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে কমলকুমার-পরিচালিত "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" দ্বিতীয়বার নয়, তৃতীয়বার অভিনীত হল। এ কথা বলার কারণ, ১৯৫৩-৫৪ সালে আলোচ্য-পরিচালকের নির্দেশনায় নাটকটির অভিনয় হয় কলকাতার এনটালিতে একটি ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানির আমন্ত্রণে তাঁদেরই কারখানায়। দ্বিতীয়বার নাটকটির পূর্বপ্রেক্ষাপট এইরূপ—শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার গুপ্ত একদিন "হরবোলা"র সভ্যদের জানান (১৯৫৩-৫৪ সালের কোনো একটি সন্ধ্যা। কমলকুমার-পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটকটির অভিনয়ের পরবর্তী কয়েক পক্ষকালের মধ্যে) যে "হরবোলা"কে কমলকুমার-পরিচালিত "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকটি অভিনয়ের জন্য এনটালির একটি ওষুধ-তৈরির কোমপানি (নামটি এতদিনে বিস্মৃত হওয়ায় উল্লেখ করা গেল না) আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সম্ভবত সেই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাদিবস বা ওইজাতীয় কিছু উপলক্ষে আমন্ত্রণটি জানানো হয়েছিল। বোধহয় ১৯৫২ সালে নাটকটি অভিনয়ের বিপুল সাফল্যই এর কারণ। ১৯৫২ সালের "লক্ষ্মণের শক্তিশেলে"র প্রায় পুরো দলটি, কেবল দু-তিনজন ছাড়া (কোনো কারণবশত যাঁদের সে সময়ে পাওয়া গেল না আর) কমলকুমারের পরিচালনায় দ্বিতীয়বার অভিনয় করলেন সেই অনুপম ব্যঙ্গনাটকটি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, এই সার্থকতার মূলে একজন মাত্র ব্যক্তিরই দান সর্বদা উপলব্ধ হয়েছিল। তিনি সেদিন সেই মঞ্চের পাদপ্রদীপের আড়ালে থাকা কমলবাবু।

সম্ভবত অনুষ্ঠানটি একটি শিল্পসংস্থার আমন্ত্রণে তাঁদেরই কারখানা-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ্যে আলোচিত হওয়ার অবকাশ হয় নি। কিন্তু যেহেতু তা কমলকুমারেরই পরিচালিত নাটকের পুনরভিনয়, সেই জন্যেই তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আর-একটি প্রসঙ্গ। নাটক পরিচালনা এবং প্রযোজনা করা কমলকুমার মজুমদারের খেয়ালখুশির চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই নয়—এই সিদ্ধান্তটির উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত প্রবন্ধের লেখক বলেছেন, কমলকুমার প্রত্যেকবারই কোনো নাটক মঞ্চস্থ করতে

মতামত

পুরোনো কুশীলবদের একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা ১৯৫২ সালে অভিনীত "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" অভিনয় করেছিলেন তাঁরা (বিশেষত) বলতে পারবেন, প্রবন্ধকারের মন্তব্যের ব্যতিক্রম ছিল কিনা। কারণ, কমলকুমার-পরিচালিত "হরবোলা"র "মুক্তধারা" নাটকটির প্রধান বা প্রায়-প্রধান চরিত্রগুলিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা সকলেই ১৯৫২ সালে মঞ্চস্থ "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতেও অভিনয় করেছিলেন।

অশোক মৈত্র
হাওড়া-৬

ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার নভেমবর ৮৭ সংখ্যায় শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দর্শন ও রাজনীতি' নিবন্ধে ভাববাদী দর্শনকে সেকালের শোষকশ্রেণী তথা কায়েমি স্বার্থের স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং চার্বাক-কথিত জড়বাদী দর্শনের তথাকথিত বৈপ্লবিক ভূমিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে মারকসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। কারণ আধুনিক বিশ্বে মারকসবাদই ইতিহাস ও সমাজের জড়বাদী বিশ্লেষণের জন্য খ্যাত।

কিন্তু যুক্তি এবং ন্যায়শাস্ত্রের সমর্থন করতে গিয়ে যুক্তিহীন আবেগের অতিশয্যে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই সত্যটা এড়িয়ে গিয়েছেন—যেমন সুবিধাবাদী শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অপব্যবহার করলে গণতন্ত্র খারাপ বা নিকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়ে যায় না, অনুরূপভাবে শত-শতাব্দী-প্রাচীন অধ্যাত্ম-দর্শনকে কেউ নিজের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইলে, সেই দর্শনের দার্শনিক মূল্যমান অবনত হয় না। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই মূল্যায়ন যথার্থ যে, একদা এ-দেশের স্থিতিশীল কায়েমি স্বার্থ অধ্যাত্মবাদ ও হিন্দুদর্শনশাস্ত্রকে উপজীব্য করে শোষিত জনমানসে নিজেদের প্রভুত্বের আসন স্থায়ী করে নিতে সচেষ্ট হয়েছিল, এবং হয়ত তদানীন্তন পরিবেশের আনুকূল্যে সাফল্যও অর্জন করেছিল—কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় দর্শনের অমূল্য সম্পদ যে অধ্যাত্মবাদ, তার উদ্ভবই হয়েছিল স্থিতাবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বা আমাদের যে-সব সর্বত্যাগী ঋষি, সন্ন্যাসী, সাধকদের হাজার হাজার বছরের সাধনার পরিণতিতে বেদ-গীতা-উপনিষদের মত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল, সংসারসুখবিমুখ সেইসব গুহা এবং তপোবনবাসী শাস্ত্রজ্ঞরা সকলেই এখনকার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মত রাজানুগ্রহধন্য, বৃত্তিভোগী, সরকারী প্রসাদপুষ্ট স্তাবকমাত্র ছিলেন। দর্শন বা রাজনীতির কোনও তত্ত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করলেই সংশ্লিষ্ট মতবাদের প্রবক্তাকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা আমাদের দেশের দুধরনের বুদ্ধিজীবীর একেবারে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে—ফ্যাসিবাদী এবং কম্যুনিস্টদের; আলোচ্য নিবন্ধের লেখক যে শ্রেণীর মধ্যেই পড়ুন, এই ধরনের প্রবণতা যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার পরিবেশ কলুষিত করে, কারণ প্রকৃত বৌদ্ধিক বিতর্কে আলোচ্য বিষয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া কাম্য,—কোনও মতবাদের প্রণেতা বা প্রবক্তাকে নয়।

যাই হোক, শ্রীচট্টোপাধ্যায় শুধু ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবাদীদের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত উদ্দেশ্যের প্রতি কটাক্ষ করেই ক্ষান্ত হননি, কখনো গীতা, কখনো উপনিষদ, কখনো বেদ, কখনো মনুসংহিতা থেকে সুবিধামত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভাববাদী দর্শন কেবল যে শোষকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সৃষ্ট তাই নয়, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শনের বর্ণনাও তৎকালীন কায়েমি স্বার্থের একধরনের রাজনৈতিক চাতুরি অর্থাৎ মানুষের মনকে জাগতিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তাকে নির্যাতন এবং নিপীড়নে প্ররোচিত করবার অশুভ উদ্যোগ! প্রসঙ্গত তিনি বিমানপোত থেকে বোমাবর্ষণের উদাহরণ দিয়েছেন এবং এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য নিবন্ধে 'পারস্যে' গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তারপরের অংশেই আছে—"খ্রীষ্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব। তাঁদের সাম্রাজ্যতন্ত্রের উড়োজাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের। সেইজন্য সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীষ্টের বুকে।" অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিযোগ দর্শনের বিরুদ্ধে নয়, সেই দর্শনের ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে, সাধকের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর তথাকথিত অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' প্রবন্ধ-সংকলনে আমরা রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে জানতে পারি, যে মহাকাব্যকে দেবীবাবু 'প্রোপাগানডা'র উপকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা ছিল ইতিহাস। আর্য-অনার্য সমাজের অন্তর্বিরোধ এবং মিলন-পর্বের প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উল্লেখ করে বলেছেন, "গোড়ায় এই মহাকাব্যের বিষয় ছিল সমাজবিপ্লব।" বলা বাহুল্য, শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর নিবন্ধে 'পরিচয়' থেকে কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন নি। কারণ এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ব্রাহ্মণ যে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় চিরকাল প্রাধান্য লাভ করে এসেছে, "ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ—এমন কথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ কথা।" অতএব—ভাববাদী দর্শনের মাধ্যমে শোষকশ্রেণী চাতুর্যের সঙ্গে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এসেছে এবং রামায়ণ-মহাভারত তাদের প্রচারযন্ত্র ছিল—এই অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেবীবাবু নিজেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করে চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তিনি ভাল করেই জানেন, রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে বা আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যাত্ম-চেতনা সম্পর্কে কবিগুরুর মত কী ছিল। 'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।...ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস

এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" আর ধর্ম-প্রসঙ্গে 'কালান্তর'-এ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বচ্ছ, "ধর্ম বলে মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো, তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার নিয়মাবলী নিখুঁত করিয়া না মান, তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আচার-বিচার-সংস্কার-অনুশাসনের মন্ত্রে গড়া পুরোহিততন্ত্র বা যাজকতন্ত্রকে ধর্ম বলে স্বীকার করেননি। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেছেন, "ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই।"

এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের যে বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদ যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের—ম্যাকস্‌মূলার থেকে রমা রঁলা পর্যন্ত তাবৎ বিদগ্ধ-জনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে, তার ছাইটুকুই দেবীবাবুর মত বুদ্ধিজীবীদের নজরে পড়ে, আগুনটা পড়ে না! নইলে,

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্‌॥"—

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু, সবই পরমেশ্বরের, উত্তমরূপ ত্যাগের দ্বারা পালন করো, কাহারও ধনে লোভ করিও না, অথবা ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না—ধন আবার কাহার?—উপনিষদের এই সুন্দর শ্লোকটুকু তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল না—যেখানে সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে। এই একটি শ্লোকই প্রমাণ করছে, ভারতীয় দর্শন-চিন্তা শুধু মানুষকে ব্রহ্ম-ভাবনার ইন্দ্রিয়াতীত কল্পলোকেই নিয়ে যায় না, পার্থিব জীবনে তাকে এক শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—

"যাবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং
তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌।
অধিকং যোঽভিমন্যেত
স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১৪।৮)

অর্থাৎ, অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করো না, যে পরিমাণ ধনে জীবিকা-নির্বাহ হয়, উদর পূর্ণ হয়, তাইতেই ব্যক্তির স্বত্ব। অধিক ভোগ করার কামনা করলে সে দণ্ডনীয় হবে।

আজ দেবীবাবুর মত যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী জড়বাদের ধ্বজা উড়িয়ে আত্মার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করছেন, তাঁদের সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর একটি মন্তব্য মনে পড়ে যায়। সংশয়ীদের সম্পর্কে তাঁর মত ছিল, 'এঁরা তো সব কিছুকেই সন্দেহ করেন, এমনকি আত্মা, অর্থাৎ নিজেদের অস্তিত্বেও সন্দিহান।' যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাবিদ কিন্তু আত্মাকে এভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কারণ বিজ্ঞান আজও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎস সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেনি—তথাকথিত জড়বাদ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার 'নেট্রো'র ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাই চেতনার অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে যা কিছু অপ্রমাণিত, তাকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করাও যেমন অযৌক্তিক, তেমনি তার অনস্তিত্ব সদম্ভে ঘোষণা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। জড়বাদেরও বয়স কম হয়নি, ক্রমশ যুক্তির প্রখর আলোয় তার অধিষ্ঠানও সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠছে। রাজনীতিতে জড়বাদী দর্শনের সূত্রগুলো যে কার্যকর হচ্ছে না, রুশ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা-নীতির পুনর্মূল্যায়ন, পোলানডেও শ্রমিক-বিদ্রোহ, চীনে ছাত্র-অসন্তোষ এবং হংকং-এ খোলা-বাজার রাখার চৈনিক সিদ্ধান্তে তার পরিচয় মিলছে। সুতরাং ভাববাদী দর্শনকে এককথায় উড়িয়ে না দিয়ে আমাদের দেখতে হবে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের এমন কোনও সমন্বয় সাধন করা সম্ভব কিনা যা একযোগে মানুষের আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। আমার মতে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শন এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌল প্রত্যয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা একালের দার্শনিকদের সেকথা ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ মহাত্মা গান্ধীই মানবতাবাদী ধর্ম-ভাবনার নব্যতম প্রবক্তা, উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' শ্লোকাংশের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা আবিষ্কার করে যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,—"ঐ কোটি কোটি বুভুক্ষু জনসাধারণ, যাদের চক্ষু দীপ্তিহীন, এবং অন্নই যাদের কাছে ঈশ্বর, তাদের ভগবানের বাণী শোনানো অরণ্যে রোদনেরই সামিল। কর্মের পবিত্র বাণী তাদের সামনে তুলে ধরলে তবেই ভগবানের বাণী তাদের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।...কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁকে ছাড়া আর কিছু আমি জানি না। এই কোটি কোটি জনসাধারণের সেবা দ্বারা আমি সেই সত্যরূপী ভগবান অথবা ভগবানরূপী সত্যের উপাসনা করি।" ('আমার ধ্যানের ভারত', গান্ধী)।

সুপ্রতীক বাগচী
১০ কে ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন।

বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতি, ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই সি এ ৪৯২০/৮১